বিষাক্ত গাছ থেকে সাবধান

প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য

বিষাক্ত গাছ থেকে সাবধান

প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য

বিদ্যা প্রকাশ

আগরতলা

বিষাক্ত গাছ থেকে সাবধান

BISHAKTA GACHH THEKE SABDHAN

(Be Aware of Poisonous Plants

– By Dr. Prasanta Kumar Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৫ ইং

প্রকাশক : শ্রী দেবব্রত ভট্টাচার্য্য
বিদ্যা প্রকাশ, পূর্ব ধলেশ্বর, রোড নং-১১
আগরতলা - ৭৯৯ ০০৭
দূরভাষ - ২৩২ ৪৯৪৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : লেখক

প্রচ্ছদ : লেখক

স্কেচ : মৌসুমী দেবনাথ

স্থির চিত্র : শিল্পী ভট্টাচার্য

অক্ষর বিন্যাস : ইউনিক কম্পিউটার, ফোন-২২২ ৪৭৪৯

মুদ্রণ : বিদ্যা প্রকাশ, প্রিন্টিং বিভাগ,
আগরতলা।

মূল্য : ২৫০ টাকা (দুইশত পঞ্চাশ)

ISBN : 81 - 89249 - 02 - 9

প্রাপ্তিস্থান :

বই ঘর
জগন্নাথ বাড়ী রোড
আগরতলা।

বিদ্যা প্রকাশ
ধলেশ্বর, আগরতলা

জয়ন্তী প্রকাশনী
ওরিয়েন্ট চৌমুহনী
আগরতলা।

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতা ডাঃ অমূল্য চন্দ্র ভট্টাচার্য

ও

স্বর্গীয়া মাতা মৃণালিনী ভট্টাচার্যের

পূণ্য স্মৃতিতে

লেখকের নিবেদন

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ এর প্রভাতী সমস্ত দৈনিক সংবাদের প্রথম খবর - -কেরন গাছের ফলের বীজপত্র খেয়ে ২৬ টি শিশু মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে । শিশুরা আগের দিন বিকেলে কেরন বীজ নিয়ে খেলছিল । তারপরই অঘটন । রাত থেকেই শুরু হয়েছে প্রচন্ড বমি, গা ঝিম ঝিম করা, মাথা ঘুড়ানো, শ্বাসকষ্ট, অস্থিরতা ইত্যাদি । শিশুদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা খুব দ্রুত উপযুক্ত ও সময়মত চিকিৎসা করাতে কোন শিশুরই মৃত্যু হয় নি । একমাত্র এই গাছের বিষাক্ততা সম্বন্ধে কোন ধারনা ছিলনা বলেই এমন অঘটন ঘটতে যাচ্ছিল ।

আজকাল 'হার্বেল চিকিৎসা' সম্বন্ধে প্রচার চলছে ব্যাপক ভাবে । টি.ভি, পত্রপত্রিকায় প্রায়ই শোনা যায় হার্বেল চিকিৎসার কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই । কিন্তু এটি সর্বতোভাবে সত্য নয় । কারণ এমন অনেক গাছ জানা গেছে যাদের মূল, কান্ড ও পাতা অত্যন্ত বিষাক্ত এমনকি এইসব গাছের রস পানে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে । তাছারা গাছ থেকে বিষ বা গাছের বিষের প্রভাবে রোগ সৃষ্টির গবেষণা আমাদের দেশে বিরল । তাই বিষাক্ত গাছ সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান ধারনার ব্যাপক মূল্যায়ন দরকার ।

এই পুস্তকে বিষাক্ত উদ্ভিদগুলিকে উদ্ভিদ বিদ্যার শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী - সাজানো হয়নি । বিষাক্ত গাছের পরিচিতি, রাসায়নিক যৌগের উপস্থিতি, সেবনে বিষাক্রান্তের লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ ধারনার জন্য এই পুস্তকের অবতারনা । যদি পাঠকদের সাহায্যে এই পুস্তকটি আসে তবে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে ।

১ লা জানুয়ারী,২০০৫

ডঃ প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য
আগরতলা ।

প্রকাশকের নিবেদন

গাছ নিয়ে সাতকাহনের কারণ কি ? গাছ মানুষকে খাদ্য, জ্বালানী, শক্তি, আবরণ, আভরণ এমনকি বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সবকিছুই দিয়ে থাকে। জরিবুটির চিকিৎসা ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন চিকিৎসার অন্যতম এবং ধর্ম-সাহিত্য বিজ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্র সবকিছুতেই জরিবুটি বা বণজ গাছপালা ব্যবহার হয়ে আসছে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে মানুষের বিভিন্ন ধরণের রোগ যেসব জরিবুটি থেকে ভাল হয় সেই সব জরিবুটিগুলি কতটা উপকারী আর কতটা অপকারী। প্রচার মাধ্যম যেভাবে কুদ্‌রতি গুণ নিয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তাতে কখনো মনে হয় না গাছের কোন ক্ষতিকারক ভূমিকা রয়েছে। বণাজি চিকিৎসা হলেই বলা হয় তাদের কোন পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই এবং সবই উপকারী। কিছু বেলেডোনা গাছ থেকে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ঔষধ অ্যাট্রোপিন পাওয়া গেলেও তা একটু বেশী পরিমানে প্রয়োগ করলে মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই বনাজী অষুধ মানুষের শুধু উপকারই করে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের বহু ক্ষতি করে, জীবনহানি করে। এমনকি বহু ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, উচ্চশ্রেণীর অনেক উদ্ভিদও মানুষের বহুরোগের কারণ এবং তাদের বিষাক্ত ভূমিকাও অপরিসীম।

বেদের সৃষ্টিকারী মনিষীগণ বিশ্বকে শুধু মধুময় রূপে কল্পনা করেছেন, গাছও মধুময় কিন্তু বাস্তবে জরিবুটির সবাই মধুময় নয়। তিক্ত, কটু, কষায়, ঝাল, টক্, মিষ্টি, তামাটে আরো কতকি স্বাদের বাহারে এরা ভর্তি।

বিষাক্ত গাছ আমাদের কিভাবে ক্ষতি করে আর উপকারী গাছ কিভাবে আমাদের উপকার করে সেটাও জানা বিশেষ প্রয়োজন। গাছ তৈরী করে অনেক রাসায়নিক যৌগ এবং এরা অন্যান্য জীবিত বস্তুর ভেতর প্রবেশ করলে জৈবনিক ক্রিয়াগুলিকে উপকারী গাছ তরান্বিত করে আর অপকারী গাছ জীবনচক্রের বহু জৈবনিক ক্রিয়ায় বাঁধা সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে প্রায় তিন লক্ষ জাতের গাছ রয়েছে। তাদের মাঝে মাত্র কয়টি গাছই এখন পর্যন্ত তীব্র বিষাক্ত বলে প্রমাণীত। তিন

হাজারেরও বেশী বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ঐসব গাছে পাওয়া যায় ।এদের মাঝে রাসায়নিক পদার্থ প্রায় কয়েক হাজার গাছের মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে ।তাই ঐ বিষাক্ত গাছগুলিকে চেনা বিশেষ প্রয়োজন ।বিষাক্ত গাছের প্রভাবে তাৎক্ষনিক বা সরাসরি দ্রুত মৃত্যু কদাচিৎ ঘটে । গ্রামাঞ্চলের ভারতবাসীরা গাছ নিয়ে বেশী সচেতন । তবুও বিষাক্ত গাছ থেকে রোগ ও মৃত্যু গ্রামাঞ্চলেই ঘটে থাকে ।কারণ তারা গাছের সংস্পর্শে বেশী আসেন ।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, চরক ও সুশ্রুত সংহিতা গ্রন্থগুলিতে একই গাছের বিভিন্ন নাম হওয়াতে তাদেরকে সঠিকভাবে চেনা এক বাস্তব সমস্যা ।তাতে রয়েছে বহু পুরোনো কিন্তু তথ্যবহুল ধন্বন্তরী, ভাবপ্রকাশ এবং রাজ নির্ঘন্টগুলিও বিভিন্ন গাছের স্থানীয় নামের উপর বা ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় নামের উপর ভেষজগুলির চিকিৎসা নিয়ে বেশীরভাগ তথ্য দিয়েছেন । ঐসব ক্ষেত্রেও প্রকৃত গাছটি চিনে নেওয়া খুবই মুশকিল ।পরবর্তী গবেষকগণ ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের প্রকাশনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনাগুলি স্থানীয় নামের মূল্যায়ন করে গাছ চিনানোর কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন ।স্যার ডেভিড হোকার এবং অন্যান্য গবেষকগণ এই সমস্ত সমাধানের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে গাছ চেনার পদ্ধতিকে মূল্যায়ণ করেছেন ।এই সমস্যাগুলি থেকে উত্তরনের জন্য আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য্যের নাম শ্রদ্ধাসহকারে সংকলিত হয় ।

আমাদের বহুল পরিচিত কিছু কিছু বিষাক্ত গাছের বৈশিষ্ট ও তাদের দ্বারা বিষক্রিয়ার লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য এই প্রস্তাবনা । পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন কিছু গাছ, তাদের সহজে চেনার বৈশিষ্ঠ্য, তাদের দ্বারা সৃষ্ট রোগ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা করা হল ।

পুস্তকটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে এই আশা করছি ।

প্রকাশক

সূচীপত্র

উদ্ভিদ থেকে বিষক্রিয়া

গ্রামের বাচ্চারা যারা প্রকৃতির গাছপালা সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত নয় কিন্তু প্রকৃতি নিয়ে উৎসুক্য যাদের প্রচুর তারা বহু গাছের পাকা ফলের রসাল ও রঙ্গীণ গঠনে আকৃষ্ট হয়ে অনেক সময় সেসব ফল খেয়ে দেখে । আবার উদ্ভিদের অন্যান্য অংশও মুখে দিয়ে দেখেনা এমন নয় । তারফলে বিশেষ কোন ক্ষতি না হলেও গা গুলানো, বমি বমি ভাব ইত্যাদি প্রায়ই হয় । তবে বেশী বিষাক্ত গাছের ক্ষেত্রে এবং শিশুদের মধ্যে, খুব কম পরিমানে বিষের ক্রিয়া বেশী হয় বলে এ সব ক্ষেত্রেও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা জরুরী । বড়দের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ থেকে বিষক্রিয়ার হার কম । অজানা বা ঠিকভাবে চেনা যায়নি এমন গাছের অংশ অথবা খাদ্যের অভাবে নূতন উদ্ভিদ অংশ খেয়ে অথবা আত্মহননের উদ্দেশ্যে বহু সময়ই উদ্ভিদ থেকে বিষক্রিয়া ঘটে । এইজন্য খাদ্যগুণ বা বিষক্রিয়া সম্বন্ধে জানা যায়নি এমন গাছের অংশ ব্যবহার অনুচিত।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিষক্রিয়ার বিচারে প্রথম হলো ঔষধ, দ্বিতীয় গৃহস্থালীর রাসায়নিক বস্তু যেমন মশা মারার স্প্রে, বাথরুম পরিষ্কারের মিউরেটিক অ্যাসিড, কীটনাশক ঔষধ, গাছের অন্যান্য ঔষধ ইত্যাদি এবং তারপরই আসে উদ্ভিদ থেকে বিষক্রিয়া । পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে মাত্র শতকরা তিনভাগ বিষক্রিয়া উদ্ভিদ থেকে হবার তথ্য জানা গেছে । ভারতে আলাদাকরে উদ্ভিদ বিষক্রিয়া চিহ্নিত করণের ব্যবস্থা নেই । 'বণাজী' ঔষধ সম্বন্ধে জনসাধারন প্রায় সম্মোহিত বলে গাছের দ্বারা বিষক্রিয়া হতে পারে এটা অনেকেই বিশ্বাস করেন না । গাছের দ্বারা আমাদের ক্ষতি হতে পারে এটা বিশ্বাস করানোর জন্য বিষাক্ত গাছের পরিচিতির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন ।

বিষ এবং বিষাক্ত গাছ বলতে কি বোঝায় ঃ—

বিষ বলতে আমাদের মনে এমন ধারনা আছে যে বিষ শরীরে প্রবেশ করলে বা খেলে মৃত্যু হয় । যদি কম পরিমানে খাওয়া হয় তাহলে দেহের অঙ্গ বিনষ্ট হয় । বিজ্ঞানী রামনাথ এবং সহকর্মীবৃন্দ বিষাক্ত উদ্ভিদ বলতে যে কোন গাছের সম্পূর্ণ অংশ অথবা তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল, বীজ, শাখাপ্রশাখা কিছু কিছু পরিস্থিতিতে যদি কোন জীবের সংস্পর্শে আসে অথবা উদ্ভিদ অংশটি ঐ প্রাণীকে খাইয়ে দেওয়া হয় তবে ঐ প্রাণীর দেহে বিষের ক্ষতিকারক লক্ষণ প্রকাশিত হয়ে প্রাণীটির মৃত্যু ঘটায় এবং ঐ বিষ কম পরিমানে দীর্ঘ দিন ব্যবহৃত হলে উহার বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে এই ধরনের বিষক্রিয়া ঘটে কিন্তু কোন প্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়া বিষক্রিয়ায় পরিগনিত হয় না ।

'A poisonous plant is one which, as a whole or a part there of, under all or certain conditions, and in a manner and in amount likely to be taken brought into contact with an organism, will exert harmful effects or cause death either immediately or by reason of cumulative action of toxic property, due to the presence of known or unknown chemical substances in it, and not by mechanical action.

বিষাক্ত উদ্ভিদের সব অংশই বিষাক্ত নয় । কিছু কিছু উদ্ভিদের মূলের বহিঃত্বক বিষাক্ত কারণ সেখানে বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তুগুলি সঞ্চিত থাকে যেমন সিঙ্কোনা অফিসিনেলিস (*Cinchona officinalis*) । এই গাছটির মূলের বহিঃত্বকে প্রচুর কুইনাইন থাকে যা অত্যন্ত বিষাক্ত । আবার পিচ *(Prunus persica)* ফলের বীজে অতি বিষাক্ত প্রুসিক অ্যাসিড থাকে । পিচফল খাওয়ার সময় আমরা বীজ ফেলে দিই বলে আমাদের মাঝে কোন বিষক্রিয়া ঘটে না ।

আবার সব প্রাণীর উপর বিষক্রিয়া সমান নয় । উদাহরণ স্বরূপ বেলেডোনা গাছের কথা বলা যায় । বেলেডোনা বেশীর ভাগ প্রাণীর মৃত্যু ঘটায় কিন্তু কিছু কিছু ইঁদুরকে প্রচুর পরিমানে বেলেডোনা খাওয়ালেও তারা বেঁচে থাকে । কিছু উদ্ভিদ মানুষ বা অন্যান্য জন্তুর উপর একমাত্র সতেজ অবস্থাতেই বিষাক্ত প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু রান্না করার পর বা শুকিয়ে ফেলার পর তাদের মধ্যে এই বিষাক্ত প্রভাব থাকে না । কিছু কিছু জংলী আলু *(Dioscorea sp.)* এবং বিভিন্ন কচু সতেজ অবস্থায় অত্যন্ত বিষাক্ত এবং রান্নার পর বিষাক্ততা বহু পরিমানে হ্রাস পায় । কিছু কিছু উদ্ভিদের অংশ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ইহাদের বিষাক্ততার প্রভাব প্রকাশিত হয় । এর প্রধান উদাহরণ খেসারী ডাল (*Lathyrus sativus*) ; দীর্ঘদিন সমানে এই ডাল খেলে নিম্নাঙ্গ অবশ হতে থাকে ।

সব উদ্ভিদে সব সময় বিষ থাকে না । জীবনচক্রের কোন এক সময় এই বিষ অতি প্রকট ভাবে দেখা দেয় । যেমন আমাদের বহু ব্যবহৃত আলু । আলুতে যখন নতুন করে গ্যাঁজ বেরুতে থাকে তখন তার মাঝে প্রচুর পরিমানে অতি বিষাক্ত 'সোলানাইন' উৎপন্ন হয় । এছাড়া কিছু কিছু বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি বা ক্যাসিয়া গাছের কান্ড এবং পাতায় একমাত্র খরার সময় অতিবিষাক্ত হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড তৈরী হয় যা জীবনহানি ঘটাতে পারে । কিছু কিছু বিষাক্ত উদ্ভিদ দেহের নির্দিষ্ট কোন অঙ্গে ক্ষতি পৌঁছায় এবং বিষের প্রভাবে মৃত্যু না হলেও ঐ সমস্ত অঙ্গ ধীরে ধীরে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । উদাহরণ হিসাবে সেনিসিও গাছের কথা বলা যায় যা

ধীরে ধীরে লিভারের কোষগুলিকে মেরে ফেলে এবং পরবর্তী সময়ে সিরোসিস অব লিভার রোগ দেখা দেয় ।

উদ্ভিদের বিষাক্ত বস্তু

বিষাক্ত উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক বস্তু থাকে । এই বিষাক্ত বস্তুগুলি বিভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন অংশে, তাদের বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়ে বিশেষ ভাবে উৎপন্ন হয় এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন বর্জ বস্তুরূপে কোষের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হতে থাকে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো —

(ক) নাইট্রোজেন গঠিত যৌগ, বিভিন্ন এলকালয়েড, পিউরিন এবং অ্যামিন

(খ) গ্লুকোসাইড (গ) সেপোনিন

(ঘ) বিষাক্ত প্রোটিন (ঙ) স্থির তৈল

(চ) উদ্বায়ী তৈল (ছ) জৈব অ্যাসিড

(১) এলকালয়েড

ইহাদেরকে সাধারনত যৌগিক বাহুচক্রিক নাইট্রোজেন গঠিত যৌগরূপে চিহ্নিত করা হয় । ইহারা ক্ষারীয় এবং প্রান্তীয় অ্যামিন যুক্ত । বেসগুলি সাধারনত বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড যুক্ত এবং প্রায়ই তারা জলে দ্রবীভূত । বেশীর ভাগ এলকালয়েড অত্যন্ত বিষাক্ত এবং ইহাদের স্বাদ তেঁতো । ফলে ইহারা উদ্ভিদের আত্মরক্ষাকারী বৈশিষ্ট রূপেও কাজ করে । সাধারনত নিম্নস্তরের উদ্ভিদের মধ্যে এলকালয়েড অনুপস্থিত । সব চেয়ে বেশী পরিমানে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে এলকালয়েড পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কোনাইন, যা হ্যামলগ গাছ থেকে পাওয়া যায় । নিকোটিন তামাক গাছ থেকে, কোররিন কোরারী গাছ থেকে, একোনিটিন একোনিটাম গাছ থেকে, এমিটিন সাইকোট্রিয়া গাছ থেকে, মরফিন আফিং গাছ থেকে, স্ট্রিকনিন কুচিলা বীজ থেকে পাওয়া যায় ।

(২) পিউরিন অথবা মিথাইল জেন্থিন

এরাও একপ্রকার নাইট্রোজেন গঠিত যৌগ এবং চা, কফি, কোকো-কোলা ইত্যাদিতে পাওয়া যায় । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক পদার্থ গুলি হলো কেফেইন, পাইলিন, থিওব্রোমাইন ইত্যাদি ।

(৩) অ্যামিন

এরা অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন । ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষাক্ত ও দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী এবং ছত্রাকে আইসো অ্যামাইলামিন রূপে পাওয়া যায় । উচ্চতর উদ্ভিদে অ্যামিনের পরিমান অত্যন্ত কম ।

(খ) গ্লুকোসাইড

এরা একগুচ্ছ জৈব যৌগ এবং বিভিন্ন উদ্ভিদে বিস্তৃত । চিনি অথবা ইহার কাছাকাছি যৌগ অথবা ফিনাইল, অ্যালডিহাইড, অ্যালকোহল ইত্যাদি গ্লুকোসাইডের মিশ্রনে তৈরী হয় । গ্লুকোসাইডের মধ্যে সবগুলিই বিষাক্ত নয় । উল্লেখযোগ্য বিষাক্ত গ্লুকোসাইড গুলি হলো হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, অ্যামিকডেলিন, ফেজিওলোনেটিন যা সিম গাছে পাওয়া যায়, গাইনোকার্ডিন, চালমুগ্রা বীজে বিস্তৃত । এছাড়া এর চেয়েও বশেী বিষাক্ত গ্লুকোসাইড হলো সিনিগ্রিন, সিনালবীন যারা সাদা ও কালো সরিষায় বিস্তৃত । জীবন সংশয়কারী গ্লুকোসাইডের মধ্যে ডিজিট্‌কসিন্‌ ডিজিবৌলিন, থিবেটিন, স্ট্রোফানটিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

(গ) সেপোনিন ঃ

প্রায় একহাজার প্রজাতির উদ্ভিদে সেপোনিন পাওয়া যায় । সেপোনিন জলের সাথে ভালভাবে মেশালে ফেনা উঠতে থাকে । এরা অত্যন্ত তেঁতো এবং এদের শুষ্ক পাউডার চামড়ার সংস্পর্শে এলে ত্বক অত্যন্ত জ্বালা করে । ঠান্ডা রক্তের প্রাণীদের ক্ষেত্রে সেপোনিন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল এবং ক্ষতিকারক বলে জলের সাথে সেপোনিন ১ ঃ ২০০০০০ অনুপাতে মিশালেও ইহারা মাছের মৃত্যু ঘটায় । নদী নালায় সেপোনিন যুক্ত গাছ কেটে থেঁতো করে জলে মিশিয়ে মৎস শিকার করা হয় ।

উষ্ণশোনীত প্রাণী অর্থাৎ গৃহপালিত পশু ও মানুষের ক্ষেত্রে সেপোনিন পাকস্থলী ও খাদ্যনালীর অভ্যন্তরে অত্যন্ত অস্থিরতা উৎপন্ন করে যার ফলে বমি এবং পরবর্তী সময়ে পাতলা পায়খানা, শরীরে খিচুনি ইত্যাদি শুরু হয় । রক্তের সংস্পর্শে এলে সেপোটক্‌সিন মানুষের রক্তের কোষগুলিকে ভেঙ্গে দেয় এবং মৃত্যু ঘটায় ।

(ঘ) বিষাক্ত প্রোটিন

উদ্ভিদের বিষাক্ত প্রোটিন গুলিকে টক্‌সঅ্যালবুমিন বলে । এরা ক্যাসিয়া, ক্রোটন, কেষ্টর ইত্যাদি ইউফরবিয়েসী গোত্রের উদ্ভিদে বিশেষভাবে বিস্তৃত । উল্লেখযোগ্য বিষাক্ত প্রোটিন হলো এক্‌সিন, ক্রোটিন, কস্টিন, বিসিন । এরা বাস্তবে রক্তেব সাথে বিক্রিয়া করে দ্রুত বক্ততঞ্চন ঘটায় এবং আক্রান্তের মৃত্যু ঘটে ।

(ঙ) স্থির তৈল

এরা গ্লিসারল যৌগ ও ফ্যাটি অ্যাসিডের মিশ্রন এবং ইহাদের মধ্যে স্টেরল দ্রবীভূত থাকে ।এরা জলে দ্রবীভূত নহে কিন্তু অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবীভূত এবং ক্লোরোফর্ম, ইথার ইত্যাদিতে দ্রবীভূত । ইহারা দ্রুত পাতলা পায়খানা ঘটায় এবং ঐ তৈল মানুষের ত্বকে প্রয়োগ করলে ফোসকা পরে এবং প্রচন্ড জ্বালা করে । বিভিন্ন উদ্ভিদে এই প্রকার স্থির তৈল বিদ্যমান ।

(চ) উদ্বায়ী তৈল

এরা উদ্ভিদে বিভিন্ন গন্ধ উৎপন্ন করে ।এদের মধ্যে বিশেষভাবে বিষাক্ত তৈল জ্বালা সৃষ্টি করে এবং ঝিল্লী পর্দার ক্ষতি সাধন করে ।বেশী পরিমানে সেবনে প্রচন্ড পেট ব্যাথা, পেটে তীব্র জ্বালা, বমি দেখা দেয় । গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে জরায়ু থেকে প্রচন্ড রক্তপাত হয়ে গর্ভপাত হতে পারে ।এই প্রকার বিষাক্ত তৈলের মাঝে উল্লেখযোগ্য জুনিপার তৈল, পেনিরয়েল তৈল, সেভিন ও রু তৈল । এরা স্নায়ুর বিষরূপে কাজ করে বলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র নষ্ট করে দেয় এবং শরীরে তীব্র কম্পন দেখা দেয় ।

(ছ) জৈব অ্যাসিড

উদ্ভিদের বিষাক্ত জৈব অ্যাসিডের মধ্যে সর্বাধিক অক্সালেট রূপে থাকে। এছাড়া ফর্মিক অ্যাসিড কিছু কিছু উদ্ভিদে পাওয়া যায় ।ইহারা মানুষের খাদ্য নালীতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে ।

এছাড়া উদ্ভিদে আরো অনেক বিষাক্ত যৌগ রয়েছে যারা পরিবেশ, পারিপার্শিক অবস্থা, রাসায়নিক গঠন ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল বলে ইহাদের কার্যও ভিন্ন প্রকৃতির ।কোন প্রাণী উদ্ভিদের ঐ সকল অঙ্গ খাওয়ার পর রোদে গেলে আক্রান্ত হয় । অ্যান্ড্রোমিডোটক্সিন, ক্লাম্বাজীন, উইনেন্থোটক্সিন ইত্যাদি ছাড়াও আরো বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ পাওয়া যায়।এইগুলি নির্দিষ্ট গাছের বর্ণনার সময় ব্যাখ্যা করা হবে।

বিষাক্ত উদ্ভিদের শ্রেণী বিণ্যাস

বিষাক্ত উদ্ভিদগুলিকে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে ।যেমন বিষের বৈশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট পরিমানে বিষের তীব্রতা অনুযায়ী, উদ্ভিদের বিষাক্ত বস্তুর রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী, বিষক্রিয়ার ফলে শারীববৃত্তীয় পরিবর্তন ও তার প্রভাবে প্রাণীর বিভিন্ন

অঙ্গের উপর ক্রিয়াশীলতা অনুযায়ী। এদের মধ্যে জীব দেহে বিষক্রিয়ার কার্যকারীতা, প্রাণীদেহের কোন কোন অঙ্গে কিরূপ ক্রিয়া করে ও কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ করে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই অনুসারে বিষাক্ত উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ-

১) জ্বলন সৃষ্টিকারী বিষ

এই প্রকার বিষ ত্বকে জ্বলন, ফোলা, ঘা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। যদি ঐ জাতীয় বিষাক্ত উদ্ভিদ খাওয়া হয় তবে পাকস্থলী, খাদ্যনালী ইত্যাদিতে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং পেটে তীব্র ব্যাথা, গা গুলানো, বমি বমি, ঝিমুনী এবং ধীরে ধীরে কোমা দশা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণ বিষাক্ত গাছের দ্বারা ত্বকে ফোলা, ফুসকুড়ি উঠা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। সেপোনিন, রেসিন জাতীয় বিষ এদের অন্তর্গত। অপর জাতের জ্বলন সৃষ্টিকারী বিষরা জীবদেহের খাদ্যনালীর কোষ নষ্ট করে ফেলে বলে রক্ত বমি হয়ে জীবের মৃত্যু ঘটে। সৌভাগ্যবসত এই প্রকার বিষ ধারনকারী গাছের সংখ্যা খুম কম।

২) স্নায়ু ও পেশীর বিষ

এই জাতীয় বিষ অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং এরা খুম কম পরিমানে বিশেষ ক্ষতি করে, এমনকি খুব দ্রুত জীবনহানি ঘটাতে পারে। এরা খাদ্যনালীর স্নায়ুকে প্রভাবিত করে এবং তীব্রপেট ব্যাথা, কম্পন দেখা দেয়। দেহের স্নায়ুগুলির তীব্র উত্তেজনার জন্য "রাইগর মর্টিস" দেখা দেয়। অপর জাতের স্নায়ু বিষে তীব্র মানসিক অবসাদ, প্রচন্ড ঘুম অথবা অঙ্গের অসারতা থেকে 'কোমা' ও মৃত্যু দেখা দেয়। কিছু কিছু বিষাক্ত পেশীবিষ সরাসরি হৃদযন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে মৃত্যু ঘটায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডিজিটেলিস, স্ট্রোফানথাস ইত্যাদি।

৩) রক্তের বিষ

এরা সরাসরি জীবদেহের রক্তের উপর ক্রিয়া করে এবং দ্রুত মৃত্য ঘটায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কেস্টর গাছের বিষ রিসিন, টক্স এলবুমিন। এরা রক্ত তঞ্চন, রক্ত কোষকে ফাটিয়ে দিয়ে প্লাজমার ক্ষতি করে দ্রুত মৃত্যু ডেকে আনে।

বিষাক্ত উদ্ভিদের শ্রেণী বিন্যাস বিষের বৈশিষ্ঠের উপর নির্ভর করে করলেও সেও সম্পূর্ণ নয়। তাই উদ্ভিদবিদ্যার শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি প্রচলিত হলে বিষাক্ত গাছকে সনাক্ত করা অনেকবেশী সুবিধাজনক ও বৈজ্ঞানিক হবে।

হ্যামলগ

মনিষী সক্রেটিসের মৃত্যু কথিত আছে এক গ্লাস হ্যামলগ বিষ পানে ঘটেছিল। কি সেই হ্যামলগ সেটা অনেকের কাছেই অজানা । হ্যামলগ ছাড়াও তার কাছাকাছি বিষাক্ত গাছ রয়েছে এবং তারা সবাই এপিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত । আমাদের সবারই পরিচিত এই গোত্রের গাছ খাবার মুখশুদ্ধির মশলা বা রান্নার মশলা হিসাবে ব্যবহৃত যেমন - জিরা, মৌরী, ধনে ইত্যাদি । এই গোত্রেরই অপর গাছ গাজর যা আমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি । তাতেও রয়েছে বিষাক্ত পলিয়েনক্যারাটপসিন । একমাত্র কম পরিমানে ব্যবহৃত হয় বলেই তাদের বিষাক্ত প্রভাব মানুষের উপর ক্রিয়াশীল হয় না । এ ছাড়া এই গোত্রের বহু গাছে ফোরানোকোমারীন থাকে যা বিষের জন্য বিখ্যাত ।

যেহেতু এই সব গাছে উদ্বায়ী তৈল বিদ্যমান এবং যেহেতু দীর্ঘদিন রেখে দিলে রাসায়নিক পদার্থের পরিমান হ্রাস পায় এই জন্য একমাত্র সবুজ গাছ খেলেই বিষাক্ততার লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।

হ্যামলগ ইংরেজী নাম হলেও তার বৈজ্ঞানিক নাম কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম *(Conium maculatum)* গোত্র এপিয়েসী । গাছগুলি ১-৩ মিটার লম্বা, সাধারণত এক বর্ষজীবী, কান্ড নলাকার, পর্বমধ্য নিরেট ও স্ফীত এবং কান্ডের গায়ে ফ্যাকাসে লাল অসংখ্য দাগ বিদ্যমান । পাতা ধনে পাতার ন্যায় এবং পুষ্পবিন্যাস ছত্রমঞ্জরী জাতীয় । ফুল সাধারণত সাদা এবং ফলের গায়ে উঁচু নীচু খাঁজ থাকে যা দেখতে মৌরীর ন্যায় ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

বিশেষ ধরণের পাইপারিডিন অ্যালকালয়েড কোনাইন উদ্ভিদের সমস্ত অঙ্গে বিস্তৃত। এছাড়া রয়েছে মিথাইল কোনাইন, গামা - কোনিসেন, কোনহাইড্রাইন ইত্যাদি । এদের অনুপাত সম্পর্ণ উদ্ভিদে ৩.৫% পর্যন্ত থাকতে পারে ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

শরীরের পেশীগুলি অবশ হতে থাকে এবং প্রথম অবস্থায় এই অবশতার ভাব পা থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পরে, কিন্তু স্নায়ুকলাগুলি সুস্থ থাকে। ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্রের পেশীগুলি অবশ হয়ে যায় এবং শ্বাসক্রিয়ার সাথে যুক্ত পেশীগুলি

সংকোচিত হয় । ফলে শ্বাসকার্য ব্যাহত হয় এবং হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায় । উদ্ভিদের মৃদবর্তী কান্ডটি কাঁচা অবস্থায় অত্যন্ত বিষাক্ত এবং তার গন্ধ সিলারী পাতার ন্যায় । শুকনো অবস্থায় বিষাক্ততা কিছুটা কমে গেলেও ইহা মৃত্যুর কারণ হতে পারে । পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে যে ৫০০ গ্রাম শুকনো পাতা গোখাদ্যের সাথে মিশিয়ে দিলে একটি ঘোড়া কয়েক ঘন্টায় মারা যায় ।

চিকিৎসা

অত্যন্ত দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিকরণ বিশেষ প্রয়োজন । দ্রুত কম্পন থামানোর জন্য ডাইজিপাম নামক ঔষধ নির্দিষ্ট পরিমানে প্রয়োগ করা হয় । চিকিৎসার পর বেশ কয়েকমাস এই বিষের কিছু কিছু প্রভাব স্থায়ী হয় ।

জংলী গাজর

যারা ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর বেড়াতে গেছেন তারা রাস্তার পাড়ে স্যাঁতস্যেঁতে ভেজা জায়গায় এই গাছটিকে প্রচুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখেছেন । হয়তবা তখন চিনতে পারেন নি । ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলে দুইহাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এ

গাছটি বেশ বিস্তৃত । এটির ইংরেজী নাম ওয়াটার হেমলগ বা কাউবেন । মূলে বেশ বড় কন্দ উৎপন্ন হয় যা দেখতে মূলা বা গাজরের ন্যায় এবং এই জন্য এর অপর নাম জংলী গাজর । এটির বৈজ্ঞানিক নাম সিকোটা ভিরোসা (*Cikota virosa*) , গোত্র এপিয়েসী । এটি অতি বিষাক্ত গাছ এবং ভারতে এর একটি মাত্র প্রজাতি পাওয়া যায় । এ গাছের কন্দাল মূল খেয়ে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ও ভারতে বহু লোক এবং অনেক তৃণভোজীর মৃত্যুর তথ্য জানা গেছে । তবে মূল শুধু নয় এ গাছের প্রতিটি অংশই অতি বিষাক্ত বলে যে কোন অংশ খেলে বিষাক্ততার লক্ষন দেখা দেয় এবং খুব দ্রুত উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে মৃত্যু অনিবার্য ।

গাছটি দেখতে বড় আকৃতির ধনে বা মৌরি গাছের ন্যায় । এরা বহুবর্ষজীবি বিরুৎজাতীয় । দেখতে উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ, পাতা সাধারণত যৌগিক, পিনেট, ধনে বা মৌরি পাতার ন্যায় । কাণ্ড সর্বাধিক দুই মিটার পর্যন্ত উঁচু, নলাকার পর্বমধ্য কিন্তু পর্বটি স্ফীত ও নিরেট । কাণ্ডে উলম্ব খাঁজ থাকে । পাতা দুই তিনটি খণ্ডকে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি খণ্ডক লেন্সের ন্যায় । যৌগিক পত্র প্রান্তীয় ও দীর্ঘবৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন । পুষ্প সাধারণত পুং বা মিশ্র জাতীয় শ্বেত বর্ণের, ছত্রমঞ্জরীযুক্ত । পুষ্প বিন্যাসে মঞ্জরীর সংখ্যা ১৫-২৫ পর্যন্ত হতে পারে । তবে মঞ্জরীপত্র অনুপস্থিত । ফল মৌরির ন্যায় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয় । ফলের গায়ে উঁচু নিচু খাঁজ থাকে । ফল ঘসলে বেশ সুন্দর কিন্তু ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধ নির্গত হয় ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

মূলে সিকোটক্সিন নামক এক প্রকার অতি বিষাক্ত যৌগিক পাইরন মিশ্রিত

অস্থায়ী রজন জাতীয় যৌগ থাকে। এছাড়া পিক্রোটক্সিন, সিকোটক্সিনিন, কিউমিনল, সাইমল, এথোসিন, এঞ্জিলসিন, পলিঅ্যাসিটাইলিন যৌগ পাওয়া যায়। এরা কন্দেই বেশী পরিমানে থাকে কিন্তু গাছের অন্যান্য অংশেও কম পরিমানে এদের পাওয়া যায় না। এ গাছে কোন এলকালয়েড বা গ্লুকোসাইড থাকে না। বীজে এক থেকে দুই ভাগ প্রয়োজনীয় তৈল থাকে যা থেকে সুগন্ধ সৃষ্টি হয়।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

সিকোটক্সিনের ক্রিয়া দ্রুত নয় কারণ এটি বেশ ধীরে ধীরে দ্রবনীয় বলো দেহে ধীরে ধীরে শোষিত হয়। কিন্তু শোষণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তার ক্রিয়া অতি দ্রুত প্রকাশ পায়। তাই কাঁচা রূপান্তরিত কান্ড খাওয়ার তিন ঘন্টা পরেই বিষাক্রান্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তীব্র ভেদ বমি ও গা গুলানো দেখা দেয়। ধীরে ধীরে পাকস্থলীতে প্রচন্ড ব্যাথা দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় এবং শরীবে তীব্র কম্পন দেখা দেয়। দ্রুত চিকিৎসা না হলে হৃদগতি তরান্বিত হতে হতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ও মৃত্যু হয়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে একটি বিড়ালকে দেহ ওজনের অনুপাতে পঞ্চাশ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজি ওজনে সিকোটক্সিন খাইয়ে দিলে অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। শিশুদের ক্ষেত্রে দশ গ্রাম রূপান্তরিক কাণ্ড বা মূল খাওয়ালেই মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা

খুব দ্রুত বমি করিয়ে পাকস্থলীর খাবার বের করে দিতে হবে এবং লবন

জল দিয়ে পাকস্থলী ধৌত করে দিতে হবে । তীব্র কম্পন থামানোর জন্য স্নায়ু শীতলকারী ঔষধ দিতে হবে । মানুষের ক্ষেত্রে মরফিন ইনজেকশন ব্যবহৃত হয় । গবেষণায় দেখা গেছে এই বিষাক্ততার চিকিৎসা হিসাবে এট্রোপিন অত্যন্ত কার্যকরী । এসব চিকিৎসার জন্য রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে । সাথে একটি বিষাক্ত গাছ নিয়ে যেতে পারলে ডাক্তারবাবুরা খুব দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন ও মৃত্যুর হাত থেকে আক্রান্ত ব্যক্তি বেঁচেও যেতে পারেন ।

এ গাছের আরো কয়টি বিষাক্ত প্রজাতি আছে । যেমন - সিকোটা মেকুলেটা এবং সিকোটা ডগলাসি । তবে ভারতবর্ষে এই প্রজাতি দুটি পাওয়া যায় না ।

ঝিলামমৌরী

হোমিওপ্যাথির বিখ্যাত ঔষধ একোনাইট এই গাছ থেকে উৎপন্ন হয় । এটি তীব্র বিষাক্ত গাছ এবং সাধারণত ঠান্ডা হিমালয়ের বিস্তৃত অঞ্চলে পাওয়া যায় । এই গাছটি রেনানকুলেসী গোত্রের এবং এর অনেক প্রজাতি অতি বিষাক্ত। ভারতের সমস্ত প্রজাতির উপর বিষাক্ত বৈশিষ্টের পরীক্ষা হয়নি । তাই এর অন্যান্য প্রজাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত । কারণ মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুর পক্ষে এগুলো অত্যন্ত বিষাক্ত । তবু কিছু কিছু এই জাতীয় বিষাক্ত উদ্ভিদ ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয় । আগের দিনে একোনিটাম গাছের মূল থেতু করে উপজাতিরা তীরের ফলায় বিষ হিসাবে ব্যবহার করতো । এছাড়া বন্যজন্তু শিকারের জন্য আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছের বিষ ব্যবহৃত হয় । দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় মিলিটারীরা যখন আসাম, সিকিম, ভুটান ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধ করতে যায় তখন বহু যোদ্ধা ঐ অঞ্চলের আদিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে একোনাইট বিষের তীরের মাধ্যমে মারা যায়। সাধারণতঃ ভেড়া, ছাগলরা একোনিটাম গাছ খায় না । কিন্তু অনেক সময় খাদ্যের অভাব হলে এই সব গাছ খাওয়ার ফলে বহু তৃণভোজী প্রাণীর মৃত্যু ঘটে ।

ভারতের একোনিটাম গাছটির প্রচলিত বাংলা নাম ঝিলাম মৌরী । *বৈজ্ঞানিক নাম Aconitum chasmanthum । এই গাছের মূলগুলি কন্দাকৃতির কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয় । আকৃতিতে শাঙ্কবাকৃতির, প্রায় ৩ সেমি লম্বা* এবং ৭সেমি । থকে ১৫ সেমি দীর্ঘ এবং ইহাদের গাত্রে তন্তুর ন্যায় রোম থাকে । কান্ডেব বহিরাবরণ পিঙ্গল হতে কালচে পিঙ্গল, মসৃণ অথবা কুঞ্চিত এবং রোদে

অস্থায়ী রজন জাতীয় যৌগ থাকে । এছাড়া পিক্রোটক্সিন, সিকোটক্সিনিন, কিউমিনল, সাইমল, এথোসিন, এঞ্জিলসিন, পলিঅ্যাসিটাইলিন যৌগ পাওয়া যায় । এরা কন্দেই বেশী পরিমানে থাকে কিন্তু গাছের অন্যান্য অংশেও কম পরিমানে এদের পাওয়া যায় না । এ গাছে কোন এলকালয়েড বা গ্লুকোসাইড থাকে না । বীজে এক থেকে দুই ভাগ প্রয়োজনীয় তৈল থাকে যা থেকে সুগন্ধ সৃষ্টি হয় ।

বিষক্রিয়াব লক্ষণ

সিকোটক্সিনের ক্রিয়া দ্রুত নয় কারণ এটি বেশ ধীরে ধীরে দ্রবনীয় বলো দেহে ধীরে ধীরে শোষিত হয় । কিন্তু শোষণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তা. ক্রিয়া অতি দ্রুত প্রকাশ পায় । তাই কাঁচা রুপান্তরিত কান্ড খাওয়ার তিন ঘন্টা পরেই বিষাক্রান্তের লক্ষণ প্রকাশ পায় । তীব্র ভেদ বমি ও গা গুলানো দেখা দেয় । ধীরে ধীরে পাকস্থলীতে প্রচন্ড ব্যাথা দেখা দেয় । পরবর্তী সময়ে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় এবং শরীরে তীব্র কম্পন দেখা দেয় । দ্রুত চিকিৎসা না হলে হৃদগতি তরান্বিত হতে হতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ও মৃত্যু হয় ।

পরীক্ষায় দেখা গেছে একটি বিড়ালকে দেহ ওজনের অনুপাতে পঞ্চাশ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজি ওজনে সিকোটক্সিন খাইয়ে দিলে অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে । শিশুদের ক্ষেত্রে দশ গ্রাম রূপান্তরিক কাণ্ড বা মূল খাওয়ালেই মৃত্যু ঘটে ।

চিকিৎসা

খুব দ্রুত বমি করিয়ে পাকস্থলীর খাবার বের করে দিতে হবে এবং লবন

জল দিয়ে পাকস্থলী ধৌত করে দিতে হবে । তীব্র কম্পন থামানোর জন্য স্নায়ু শীতলকারী ঔষধ দিতে হবে । মানুষের ক্ষেত্রে মরফিন ইনজেকশন ব্যবহৃত হয় । গবেষণায় দেখা গেছে এই বিষাক্ততার চিকিৎসা হিসাবে এট্রোপিন অত্যন্ত কার্যকরী । এসব চিকিৎসার জন্য রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে । সাথে একটি বিষাক্ত গাছ নিয়ে যেতে পারলে ডাক্তারবাবুরা খুব দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন ও মৃত্যুর হাত থেকে আক্রান্ত ব্যক্তি বেঁচেও যেতে পারেন ।

এ গাছের আরো কয়টি বিষাক্ত প্রজাতি আছে । যেমন - সিকোটা মেকুলেটা এবং সিকোটা ডগলাসি । তবে ভারতবর্ষে এই প্রজাতি দুটি পাওয়া যায় না ।

ঝিলামমৌরী

হোমিওপ্যাথির বিখ্যাত ঔষধ একোনাইট এই গাছ থেকে উৎপন্ন হয় । এটি তীব্র বিষাক্ত গাছ এবং সাধারণত ঠান্ডা হিমালয়ের বিস্তৃত অঞ্চলে পাওয়া যায় । এই গাছটি রেনানকুলেসী গোত্রের এবং এর অনেক প্রজাতি অতি বিষাক্ত। ভাবতেব সমস্ত প্রজাতির উপর বিষাক্ত বৈশিষ্টের পরীক্ষা হয়নি । তাই এর অন্যান্য প্রজাতির ব্যবহারেব ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত । কারণ মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুর পক্ষে এগুলো অত্যন্ত বিষাক্ত । তবু কিছু কিছু এই জাতীয় বিষাক্ত উদ্ভিদ ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয় । আগের দিনে একোনিটাম গাছের মূল থেতু করে উপজাতি. ' তীরের ফলায় বিষ হিসাবে ব্যবহার করতো । এছাড়া বন্যজন্তু শিকারের জন্য আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছের বিষ ব্যবহৃত হয় । দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় মিলিটারীরা যখন আসাম, সিকিম, ভুটান ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধ করতে যায় তখন বহু যোদ্ধা ঐ অঞ্চলের আদিবাসীদের দ্বাবা আক্রান্ত হয়ে একোনাইট বিষের তীরের মাধ্যমে মারা যায়। সাধারণতঃ ভেড়া, ছাগলরা একোনিটাম গাছ খায় না । কিন্তু অনেক সময় খাদ্যের অভাব হলে এই সব গাছ খাওয়ার ফলে বহু তৃণভোজী প্রাণীর মৃত্যু ঘটে ।

ভারতের একোনিটাম গাছটির প্রচলিত বাংলা নাম ঝিলাম মৌরী । বৈজ্ঞানিক নাম *Aconitum chasmanthum* । এই গাছের মূলগুলি কন্দাকৃতির কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয় । আকৃতিতে শাঙ্কবাকৃতির, প্রায় ৩ সেমি লম্বা এবং ৭সেমি থেকে ১৫ সেমি দীর্ঘ এবং ইহাদের গাত্রে তন্তুর ন্যায় রোম থাকে । কান্ডের বহিরাবরণ পিঙ্গল হতে কালচে পিঙ্গল, মসৃণ অথবা কুঞ্চিত এবং রোদে

শুকালে এরা ফেটে যায় । কান্ড প্রায় ৪০ সেমি দীর্ঘ । পাতা অসংখ্য । নীচের দিকের পাতার বৃন্ত বড় গোলাকার হতে বৃক্কাকৃতিব কিন্তু উপরের দিকের বৃন্তগুলি তিনটি শিরায় বিভক্ত,বহু খন্ডিত এবং প্রতিটি খন্ড সরু দীর্ঘ ও অগ্রভাগ সূচাগ্র । পুষ্পগুলি একটি দন্ডের উপর সজ্জিত থাকে । ভারতে এদের ১৯ টি প্রজাতি পাওয়া যায এবং এদেব বেশীর ভাগই তীব্র বিষাক্ত ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

এই গোত্রের গাছে বহু বিষাক্ত যৌগ পাওয়া যায, যাবা চামডায ঘা থেকে হৃদযন্ত্র বিকল করে দেওযাব মতো গ্লুকোসাইড সেপোনিন উৎপন্ন কবে । এলকালযেড হিসাবে একোনিটিন, সিউডো - একোনিটিন, ইন্ড - একোনিটিন, জেপ একোনিটিন, মেসাকোনিটিন, জেস - একোনিটিন, ল্যাপাকোনিটিন, পালমেটিন, বাববাবিন, কোলাম্বাক্সিন, ডেলফিনিন, ডেলফিসিন, সেট্‌ফিস্যাগ্রোইন, এজাসিন, সেলিয়মিন, স্প্রিনটিলাক্ষইন, স্পিবিনটিলিন, হাইড্রাস্ট্রিন, ক্যানাডাইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

গ্লুকোসাইড হিসাবে এডোনিন, এডোনিডিন, এলিবোরিন, হেলিবোরিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া বিভিন্ন গণে ভিন্ন ভিন্ন সেকোনিন, সায়ানোজেন গঠিত যৌগ, বিষাক্ত লেপটোন জাতীয় যৌগ বিভিন্ন গণ ও প্রজাতিতে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে পাওযা যায় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

একোনিটাম গাছের বিষ শ্বাস কার্যের সাথে গন্ধ শুকলে ফুসফুসে তীব্র সংকোচনের ফলে প্রচন্ড কাস ও হাঁচি আসতে থাকে এবং তা দীর্ঘ দিন চলে । যদি

উদ্ভিদের কোন অংশ চিবিয়ে খাওয়া যায় তবে প্রথম অল্প মিষ্টি লাগলেও পরে মুখের ভিতর জ্বালা করতে থাকে এবং মুখ থেকে লালা নিঃসরণ হতে থাকে ও দাঁতের মাড়ি ও জিহ্বা অসাড় হয়ে আসে। বেশী পরিমাণে খেয়ে নিলে পাকস্থলীতে জ্বালা, বমি বমি ভাব, মুখে অত্যাধিক থুতু উঠা ও ডাইরিয়া দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে জ্বালাভাব রূপান্তরিত হয়ে অসাড়তা আসে। প্রথম অবস্থায় অস্থিরতা দেখা দেয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে হৃদস্পন্দনের হার কমে আসে। পেশীগুলি দূর্বল হয়ে যায়। চামড়ার উপরটি যেন ঠান্ডা হয়ে আসে। চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসে। শরীরে কম্পন প্রায়ই দেখা দেয়। ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়। বিষক্রিয়ার ২-৬ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা

একোনিটাম গাছ খেয়ে নেওয়ার পর অতি দ্রুত পাকস্থলী ধুয়ে বমি করানো প্রয়োজন। রোগলক্ষন অনুযায়ী চিকিৎসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হৃদগতি নিয়ন্ত্রনে এবং অন্যান্য রোগ লক্ষন নিয়ন্ত্রনে এট্রোপিন প্রয়োগ করা হয়। খুব খারাপ অবস্থায় হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রনের জন্য হৃদ উত্তেজক ঔষধ দেওয়া জরুরী। এজন্য হাসপাতালে দ্রুত স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

একোনিটামের বিষাক্ত ভারতীয় প্রজাতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - একোনিটাম বালফোরী, একোনিটাম চেসমেনথাম, একোনিটাম ডাইনারহিজাম। এদের আকৃতি অনেকটা ঝিলাম মৌরীরই মত।

সাইক্লামেন

ঘর সাজানোর গাছ হিসাবে সাইক্লামেন বহুল ব্যবহৃত। শীতকালে গাছগুলির পাতা খসে পরে যায় এবং বর্ষার নতুন জলের সাথে সাথে নতুন পাতা গজায়। বৈজ্ঞানিক নাম *Cyclamen purpurascens*, গোত্র প্রাইমোলেসী। গাছটির জন্ম বিদেশে এবং সারা পৃথিবীতে ঘর সাজানোর গাছ হিসাবে এটি বহুল ব্যবহৃত।

পাতার নীচে বেশ বড় বড় ডগা থাকে এবং পত্রফলকটি শালুক পাতার ন্যায় গাঢ় সবুজ আর সাদা ও গোলাপী ছোপে ভরপুর। পাতার উপর

অসংখ্য রোম থাকে ।এই রোমগুলি বেশীরভাগ বৃতি ও পুষ্প বৃন্তেও দেখা যায় । এটি জলজ গাছ । কান্ড ও মূল জলে নিমজ্জিত বা স্যাঁত স্যাঁতে মাটিতেও এরা বাঁচতে পারে ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

রোমগুলিতে বেঞ্জোকুইনন জাতীয় যৌগ থাকে ।একে প্রাইমিন বলে । এটি চামড়ার সংস্পর্শে এলে অ্যালার্জের নামক যৌগের প্রভাবে অত্যন্ত গভীর ক্ষত চামড়ায় সৃষ্টি করে ।গাছটিকে স্পর্শ করলে বা পুরনো পাতাগুলিকে পরিষ্কার করতে গেলে চামড়ার সাথে উদ্ভিদের অন্য অংশের সংযোগ ঘটলে ততক্ষণাৎ চামড়ায় চুলকানি সৃষ্টি হয় ।সাইক্লামেনের গোলাকার কন্দে ট্রাইটারপিনয়েড সেপোনিন থাকে ।এর মধ্যে সাইক্লামিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং খাদ্যের অভাবে এই কন্দ সেবনে বমি, পাতলা পায়খানা, সারাদেহে কম্পন এবং ধীরে ধীরে অঙ্গ শিথিল পর্যন্ত হতেপারে ।আগের দিনে সাইক্লামেনের কন্দ চূর্ণকরে কুষ্ঠ কাঠিন্য দূর করার জন্য সেবন করা হতো ।

চিকিৎসা

বিষাক্ত এই গাছের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।বাচ্চাদের কাছাকাছি এসব গাছ রাখা ঠিক নয় কারণ স্পর্শেই ডারমাটাইটিস নামক চামড়ার রোগ হতে পারে ।এছাড়া চামড়ার উপর বিভিন্ন প্রকার স্ফীতি দেখা দিলে স্ফীতি রোধ করার ঔষধ এবং অস্থিরতা রোধ করার ঔষধ ব্যবহার করা প্রয়োজন ।প্রয়োজনে বিষেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করা জরুরী ।

তেঁতো ঝিঙ্গা

সারা ভারতে এ গাছটি সর্বত্র বিস্তৃত এবং প্রতিটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক নামে পরিচিত । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তেঁতো ধুন্দুল, ঘসা লতা, তেঁতো তোরাই ইত্যাদি নামে এটি পরিচিত ।গুজরাটে একে ঝুম ধাধন, হিন্দিতে ঝিমানী, কার্বটারোই এবং মালয়ালম ভাষায় একে আতাঙ্খা বলে । কানাড়ী ভাষায় একে কাঁড়ুহীরে, মারাঠীতে ডিঙালী, কাঁদুশিরালী, রানটুরাই ইত্যাদি বলে ।পাঞ্জাবে এর নাম কালীটুরি এবং সংস্কৃতে এটি ভেনীয়া । ইউ পিতে এর নাম ক্যারোলা এবং উর্দূতে একে বান্দাল বলে । গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম লুফা একুটাঙ্গুলা *(Luffa acutangula)* গোত্র কিউকারবিটেসী ।

এ গাছটির ফল তেঁতো ঝিঙ্গা হিসাবে খাওয়া হয় । এক মাত্র কাঁচা অবস্থায় যখন ফলে তন্তু সৃষ্টি কম হয় তখনই এটি খাওয়াব যোগ্য থাকে । এটির 'আমাবা' নামে একটি জঙ্গলী জাত রয়েছে যেটি পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জঙ্গলী ঝিঙ্গা রূপে পাওয়া যায় ।

গাছটি লতানো, পাতা ৫ টি শিরা যুক্ত, করতলাকার আকৃতি ধারণ করে । বৃন্তগুলি বেশ বড় এবং প্রতি পর্ব থেকে পাতার বিপরীত প্রান্তে আকর্ষ নির্গত হয় । এরা সহবাসী কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা আলাদা । ফল প্রায় ২০ সেমি দীর্ঘ এবং গদাকৃতির অথবা মাঝখানটি মোটা এবং দুই প্রান্ত সরু, লম্বালম্বি ভাবে শিরাযুক্ত ও শিরার সংখ্যা সর্বদাই ১০ টি । বীজগুলি চ্যাপ্টা, ডিম্বাকার থেকে লম্বাটে এবং প্রান্তগুলি পক্ষযুক্ত নয় । বীজের বর্ণ কালো ।

ব্যবহার

ফলগুলি থেকে একটি থক্‌থকে তেঁতো বস্তু পাওয়া যায় যা থেকে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয় । তৈলটির নাম লুফা তৈল । বীজ থেকে উৎপন্ন খোল তেঁতো এবং বিষাক্ত । এজন্য চারাপোনা তৈরীর পুকুরে মাছ মারা বিষরূপে এটি প্রয়োগ করলে ব্যাঙাচি থেকে শুরু করে সমস্তপ্রকার কীট মারা যায় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

তেঁতো ঝিঙ্গা একটু বেশী পরিমানে সেবনে গা বমি বমি, তীব্র তরল পায়খানা এবং পেট ব্যথা দেখা দেয় ।

চিকিৎসা

তরল পায়খানা বন্ধ কবার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং ইলেকট্রোলাইট দ্রবন পান করাতে হবে । শুধু তরল পায়খানা ছাড়া গা বমি বমি করা ইত্যাদির জন্য ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন নেই । কারণ লক্ষনগুলি ধীরে ধীরে কমে যায় । তেঁতো ঝিঙ্গা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ না করাই ভালো ।

হস্তীঘসা ধুন্দুল

এটি বহু শাখা যুক্ত পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ এবং বড় বড় গাছের মাথা পর্যন্ত প্যেঁচিযে উপরে উঠে যায় । আসামে এটির নাম ভাত কাকরেল বা ভাত করলা, উত্তর প্রদেশ এটির নাম দিল পসন্দ, গুজরাটে একে কলাকা বা টুরিয়া বলে । হিন্দিতে এর নাম পুরুডা বা ঘিয়া তারুই, পাঞ্জাবে এটিকে ঘি - গাভ্রালী বলে । সংস্কৃতে একে দীর্ঘপাটোলীকা বলে; তামিলে এটির নাম পিচুক্কো বা পিক্কো, তেলেগুতে এর নাম গুট্টিবিড়া এবং নেট্টিবিড়া । এটির ইংরেজী নাম স্পঞ্জ গার্ড বা টাওয়েল গোর্ড বা ওয়াসিং গোর্ড । এটিব বৈজ্ঞানিক নাম লুফা সিলিনড্রিকা *(Luffa cylindrica)*, গোত্র কিউকারবিটেসী

এই গাছের পাতাগুলি বেশ বড়, করতলাকার, ১২-১৫ সেমি দীর্ঘ । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে লম্বার চেয়ে প্রস্থে বৃহৎ । পাতার উপরিতল ছোট্ট রোমাবৃত । পুং পুষ্পগুলি গুচ্ছাকারে ৪-২০ টি করে রেসিম বিন্যাসে সজ্জিত থাকে এবং পাতার অক্ষ থেকে নির্গত হয় । স্ত্রী পুষ্পগুলি একক, ডিম্বাশয় নলাকার, বেশ বড় । ফল প্রায ২০ সেমি দীর্ঘ এবং দুইপ্রান্ত ভোতা ও ফলের উপরে শিরা বিদ্যমান । বীজগুলি কালো অথবা বাদামী, ৩ সেমি দীর্ঘ, চ্যাপ্টা, কখনো কখনো অসমান ।

ব্যবহার

উদ্ভিদের ফল পেঁকে গেলে তার গায়ে গাঢ় তন্তু দেখা দেয় এবং এজন্য স্নান করার সময় গা ঘষানোর কাজে এটি ব্যবহৃত হয় ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

উদ্ভিদের ফলে প্রচুর পরিমাণে সেপোনিন থাকে এবং মিউসিন নামে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ তাতে পাওয়া যায় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

ফলের রস কুষ্ঠ - কাঠিন্য দূরীকরণে কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয় এবং পরিমাণে বেশী হলে তীব্র তরল পায়খানা, গা গুলানো ইত্যাদি দেখা দেয় । বীজগুলি থেকে আমাশয় সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী পেট ব্যথা দেখা দেয় ।

চিকিৎসা

তীব্র রোগ লক্ষণ দেখা দিলে যেসকল ঔষধে এ গাছের ফল ব্যবহার করা হয় ঐসব ঔষধ সেবন বন্ধ করতে হবে । তরল পায়খানা দীর্ঘক্ষন স্থায়ী হলে এক লিটার নাতিশীতোষ্ণ জলে এক চামচ লবন, আট চামচ চিনি এবং একটু খাওয়ার সোডা মিশিয়ে বিষাক্রান্তকে পান করাতে হবে । পেট ব্যাথা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ দরকার ।

চিলার

এ গাছটির বাংলা নাম মৌন, গুজরাটে এটিকে ঘুলৌন বলে । হিন্দিতে এর বহু নাম অনেক যেমন বইরা, চিল্লা, চুরচু । ভারতে বহু জায়গায় এটি চিল্লা নামে পরিচিত । কানাড়া ভাষায় একে বিলিওবিনা বা হানাইজ বলে । মারাঠী ভাষায় এটির নাম কারেই বা মাসেই বা মজী, পাঞ্জাবীতেও চিলা । তামিলে কাউচ্চি বা কোট্টাল, তেলেগুতে গামগুডু বা গিরুগুডু । উড়িয়ায় একে বলে কোকড়া । গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম ক্যাসিয়ারিয়া টমেনটোজা *(Casearia tomentosa)*, গোত্র সেমিডেসী ।

এটি বনে বড় গাছ কিন্তু রাস্তার পাশে বা একক ভাবে ক্ষুদ্র বৃক্ষ বা ঝোপ তৈরী করে । গাছের কচি শাখাগুলি ছোট ছোট রোম যুক্ত অথবা উপরিতল মসৃণ, নিম্নতল রোমাবৃত । কদাচিৎ পাতার উপরিতল মসৃণ । উপপত্র ক্ষুদ্র এবং পাতা একটু বড় হলেই উপপত্রগুলি খসে পড়ে । সর্বাধিক ১০ সে.মি. দীর্ঘ এবং ৫ সে.মি. প্রস্থ, ল্যান্সের ন্যায় অথবা বিডিম্বাকার, পাতার অগ্রভাগ সরু, সূচাগ্র এবং প্রান্তগুলি দাঁতের ন্যায় বা ঘন রোমাবৃত । ফুলের বৃন্ত রোমাবৃত এবং ফুলগুলি আকৃতিতে ক্ষুদ্র, ০.৫ সে.মি. ব্যাস যুক্ত, সবুজ ও হলুদের মিশ্রণ বৃতিতে থাকে । ফুলের গর্ভমুন্ড অর্ধগোলাকার, ফলগুলি প্রায় ১ সে.মি. লম্বা, হরিদ্রা বর্ণের, ক্যাপসিউল জাতীয় ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

উদ্ভিদের ফল এবং পাতায় বিশেষ পরিমাণে সেপোনিন থাকে । এছাড়া

মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ মানুষের মাঝেও বিষাক্ততা সৃষ্টি করে । গৃহপালিত জন্তুরা এগাছ মুখে দেয় না কারণ এরা অত্যন্ত তেঁতো ও বিস্বাদ ।.

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

পাতা বা ফলের রস থেকে যে রাসায়নিক নির্গত হয় এগুলি মানুষের দেহেও বিষক্রিয়া ঘটায় । তার ফলে গা গুলানো, মাথায় যন্ত্রণা, চোখে কম দেখা, হাত পায়ের অসাড়তা ইত্যাদি দেখা দেয় । তবে এসব বিষক্রিয়া সাধারণত গ্রামীণ ঔষধ থেকে হতে পারে কারণ এ গাছের পাতা লিভারের উদ্দীপক ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয় ।

চিকিৎসা

রোগলক্ষন দেখা দেওয়া মাত্র দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা প্রয়োজন । প্রাথমিক ভাবে খুব দ্রুত বমি করিয়ে পাকস্থলী থেকে বিষাক্ত পাতা ও রস বের করে দিতে হবে ।

কাঠগোলাচী

গাছটি সারা ভারতে পাওয়া যায় এবং পশ্চিমবঙ্গে এর নাম গরুর চাঁপা । মহারাষ্ট্রে এটিকে চামেলী বা ডোলোচাঁপা বা খইর চাঁপা বলে । হিন্দিতেও এটি চামেলী নামে পরিচিত । আবার কেউকেউ একে গোলচিন বলে । এর বৈজ্ঞানিক নাম প্লুমেরিয়া একুমিনাটা *(Plumeria acuminata)* গোত্র অ্যাপোসাইনেসী । এটির ইংরেজী নাম পেগুটা ট্রি বা স্পেনীস জেসমিন ।

এটি একটি ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ এবং উপরিভাগের শাখাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাতা থাকে । গাছের শাখাগুলি দ্যাগ্রভাবে বিভক্ত এবং নীচের দিকের কাণ্ডে পত্রবৃন্তের দাগগুলি খসে পড়ার চিহ্ন দেখা যায় । প্রতিটি পাতা বেশ বড়, ল্যান্সের ন্যায় । মাঝখানটি বিস্তৃত এবং দুইপাশে ক্রমান্বয়ে সরু । শাখাগুলি বেশ স্ফীত এবং রসালো । শাখার অগ্রভাগে সারা বছর ফুল ফোটে

এবং গুচ্ছাকারে বহুফুল কাছাকাছি থাকলেও প্রতিটি বৃন্তে একজোড়া করে ফুল দেখা যায়। প্রত্যেকটি ফুলের পাঁচটি করে পাপড়ি এবং পাপড়ির নীচের অংশটি সর্পিলাকারে প্যাচানো। নলাকার সংযোগ অংশটি হরিদ্রাভ এবং রসালো পাপড়িগুলির প্রান্তভাগ সাদা। পুংধানী তীরের ফলার ন্যায়। ফল একজোড়া ফলিকল জাতীয়, প্রায় আট সে.মি. দীর্ঘ।

ব্যবহার

গাছটির ফুল ভারতে সর্বত্র পূজায় ব্যবহৃত হয়। রাস্তার পাশে ছায়া ঘেরা উদ্ভিদ হিসাবেও এই গাছটি লাগানো হয় কারণ এরা তীব্র প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। গাছের ৩-৩ ফোটা তরুক্ষীর জলের সাথে মিশিয়ে কুষ্ঠ কাঠিন্য দূর করার জন্য খাওয়ানো হয়। গ্রামে কৃত্রিম গর্ভপাতে এই গাছের অগ্রস্থ শাখাগুলি থেতু করে জরায়ুতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

বিষাক্ত রাসায়নিক

উদ্ভিদের ত্বকে প্রচন্ড তিতা গ্লুকোসাইড - প্লুমেরিড পাওয়া যায়। এটিকে ক্ষারের সহিত বিক্রিয়া করলে প্লুমেরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এছাড়া তরুক্ষীর থেকে প্লুমেরিক অ্যাসিডও পাওয়া যায়।

বিষাক্ততার লক্ষণ

সাধারণত এই গাছের কোন অংশ কেটে দিলে তার থেকে তরুক্ষীর নির্গত হয় এবং রাবারের ন্যায় গঠন সৃষ্টি করে। তরুক্ষীর ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের সময় পরিমাণ অধিক হলে বিষাক্ততার লক্ষণ দেখা দেয়। এছাড়া গোপন গর্ভপাতের সময় এ গাছটি ব্যবহার করতে গিয়ে বিষাক্ততার লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণত জরায়ুর প্রসারণ ঘটে এবং পৌষ্টিক নালীর প্রসারণের ফলে তরল পায়খানা হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া, হৃদযন্ত্রের গতি কমে আসা ইত্যাদি লক্ষণও কিছু কিছু বিজ্ঞানী উল্লেখ করেছেন।

চিকিৎসা

অবৈজ্ঞানিক ভাবে গর্ভপাতের জন্য এ উদ্ভিদ ব্যবহার করা উচিত নয়। এমনকি ঔষধ হিসাবেও সরাসরি এই গাছের রস ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ এর ফলে রক্তচাপ জনিত রোগ দেখা দিয়ে জীবন সংশয় ঘটতে পারে। রোগলক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ব্যবস্থা নিতে হবে। অত্যাধিক উত্তেজনা শরীরে দেখা দিলে ডাইজীপাম জাতীয় ঔষধ খাইয়ে রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

জাবরান্ডী

জাবরান্ডী তৈল আমাদের দেশে চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম পিলোকার্পাস জাবরান্ডী, *(Pilocarpus jaborandi)* গোত্র
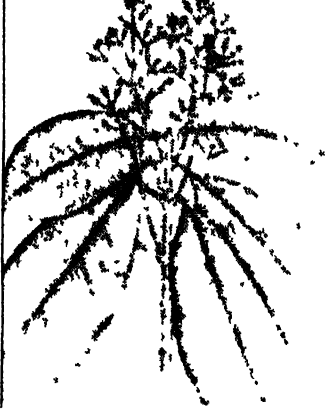
রুটেসী। গ্রীক ভাষায় পিলস কথার অর্থ টুপি এবং কার্পস কথার অর্থ ফল অর্থাৎ ফুলের উপর টুপির ন্যায় একটি আবরণ থাকে বলে এর নাম পিলোকার্পাস।

গাছটি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার নাতিশীতোষ্ণ বা উষ্ণ অঞ্চলে এরা বিশেষ ভাবে বিস্তৃত। গাছগুলি বহু শাখাযুক্ত, গুল্ম। এরা গ্রন্থিকোষযুক্ত এবং সুগন্ধী। পাতাগুলি একান্তর, ডিম্বাকার, অনুপপত্রিক, সরল। ফুলগুলি বহু প্রতিসম, উভলিঙ্গ। বৃতি বেশ ছোট, পাঁচটি। পাপড়ি পাঁচটি বেশ ভারী, সুগন্ধ যুক্ত। পুংধানীও পাঁচটি এবং একটি চাকতির ন্যায় অংশের সহিত যুক্ত। ডিম্বাশয় পাঁচটি, মুক্ত এবং প্রত্যেক ডিম্বাশয়ে দুটি করে ডিম্বক থাকে। ফল ড্রুপ জাতীয় কমলা লেবুর ন্যায়।

ব্যবহার

জাবরান্ডী তৈল ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং কেশ বিন্যাসে এটি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ঔষধে এই গাছ থেকে পাওয়া এলকালয়েড ব্যবহৃত হয়।

রাসায়নিক গঠন

গাছের পাতায় পিলোকার্পিন, আইসোপিলোকার্পিন এবং পিলোকার্পিডিন থাকে। এছাড়া ০.৫ থেকে ১ শতাংশ তৈল থাকে। ঐ জাতীয় তৈলে কিছু হাইড্রোকার্বন এবং মিথাইলনোনিল কিটোন থাকে।

বিষাক্ততার লক্ষণ

পিনোকার্পিন বিভিন্ন গ্রন্থীর নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। ফলে পাচক রস, লালা,চোখের জল ইত্যাদি নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। দেহের অনিয়ন্ত্রিত পেশীগুলি বেশী পরিমাণে আক্রান্ত হয়। এই গাছের রস বেশী ব্যবহার করলে তরল পায়খানা, ঘোলাটে দৃষ্টি, হৃদগতি হ্রাস পায় এবং বেশী পরিমাণে কফ্ নিঃসরণ হতে থাকে। মাথার স্নায়ুগুলি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং হৃদপেশীর কার্যশীলতা নষ্ট হয়ে অথবা শ্বাসযন্ত্রের

ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দ্রুত মৃত্যু হয় । এছাড়া শ্বাস যন্ত্রে শোথ নামার ফলেও মৃত্যু হয় ।

চিকিৎসা

সাধারণতঃ রোগলক্ষনগুলি দেখা মাত্রই মানুষ অথবা গৃহপালিত জন্তুকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন । পিলকারপিনের প্রতিষেধক এট্রোপিন বা এট্রোলিন । ইহারা পিলকারপিনের বিষক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে । এইজন্য উদ্ভিদ এলকালয়েড থেকে উৎপন্ন রোগলক্ষনের চিকিৎসায় যেসমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় এক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থাগুলি দ্রুত নেওয়া প্রযোজন ।

নইরা গাছ

পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব কটি রাজ্যে এ গাছ পাওয়া যায় না। এই জন্যে এর বাংলা নাম নেই । এটি উত্তর - পশ্চিম হিমালযের কাশ্মীর থেকে উত্তর কাশীর বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৫০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত । এটির গারুয়ালে সাধারণ নাম নের, ল্যাপচা ভাষায় টিম্বাবনিয়ক, পাঞ্জাবে বাক. শ্বাসবা, স্বালাভী ইত্যাদি । নেপালে ছুমলানী এবং কুমায়ুণ অঞ্চলে এটি নেহার বা গোর্ল পাতা নামে
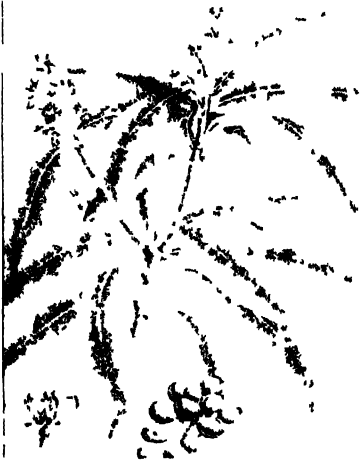
পরিচিত । গাছটিব বৈজ্ঞানিক নাম স্কি মিয়া লাউরিওলা *(Skimmia lauriula)*, গোত্র রুটেসী ।

গাছটি সর্বাধিক ২.৫ মিটার উঁচু । পাতা প্রায ১০ সে.মি. দীর্ঘ. ডিম্বাকার বা ল্যান্সের ন্যায় এবং শাখার অগ্রভাগে গুচ্ছাকারে সজ্জিত। ফুলগুলি সাদা বা হরিদ্রাভ, ঘন সন্নিবিষ্ট, এক বা উভলিঙ্গ এবং পেনিক্যাল জাতীয় বিন্যাসে সজ্জিত । প্রতিটি ফুলেব ব্যাস এক সেন্টিমিটাবের বেশী নয় । বৃতি পাঁচটি ও স্থায়ী । পুংধানী পাঁচ বা তার অধিক, ডিম্বাশয় তিনকোষী,ফল ড্রুপ জাতীয় গাঢ় লাল বর্ণের এবং কখনো কখনো একটি বা তিনটি বীজ ধারণ করে ।

ব্যবহার

এগাছের পাতা সুগন্ধি হিসাবে কাশ্মীর অঞ্চলে ধূপ ধূনা দেওয়ার সময় ব্যবহার করা হয ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

শুষ্ক পাতায় ০.৫ শতাংশ অ্যালকালয়েড থাকে ।এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো স্কিমিয়েনাইন নামক একটি যৌগ ।এছাড়া এক বিশেষ ধরনের তৈল পাতায় ০.৫ - ১.০ অনুপাতে পাওয়া যায় ।এই তেলে বিটাফিলান্ড্রিন, আলফাপিনিন, লিনালল,অ্যাজুলিন, লাইনালিল অ্যাসিটেট ইত্যাদি থাকে ।

বিষাক্ততার লক্ষণঃ এই গাছের পাতা খেয়ে ছাগল ও ভেড়ার মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায় এবং এই বিশ্বাস মেষ পালকদের মধ্যেও বর্তমান ।

রোগলক্ষণ

উষ্ণশোনীত প্রাণীদের মধ্যে এমনকি অনুষ্ণশোনীত প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এ গাছের রস তীব্র বিষাক্ত ।এটি প্রচন্ড বমি, অতি ধীর হৃদস্পন্দন, সারা শবীর ঠান্ডা হয়ে আসা, জিহ্বা ফোলে আসা, অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ হতে হতে মৃত্যু ঘটতে পারে।

চিকিৎসা

যথাসম্ভব এ গাছকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো ।কোন কারণে পাতা বা রস মুখে গেলে দ্রুত চিকিৎসার জন্য রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এবং পাকস্থলী ধৌত করে লক্ষন অনুযায়ী দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে ।

নেপালী ধনিয়া

এ গাছটি উত্তব পূর্বাঞ্চলের খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় থেকে হিমালয়ের
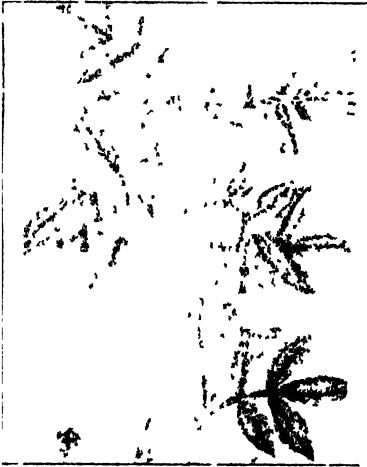
ভূটান অঞ্চল, গাঙ্গেয় উপত্যকা হয়ে বিশাখাপত্তনম পর্যন্ত পাওয়া যায় । প্রায় ১৫০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এরা বিস্তৃত ।আবার ভূটানের কিছু কিছু অংশে প্রায় ২০০০ মিটার এর বেশী উচ্চতায় এটি পাওয়া যায় ।

আরবী ভাষায় এই গাছটির নাম ফাগীরা, বাংলাদেশে একে গৈরা বা নেপালী ধনিয়া বা তুন বলে । হিন্দিতে এর নাম তেজ ফল বা তেজ মল বা টুমরু বা ডার্মার ইত্যাদি অঞ্চল ভিত্তিক নাম পাওয়া যায় । ল্যাপচা ভাষায় এটি সুংরুকুং, পাঞ্জাবীতে কাবাচা, তিমাল বা টিমরু, উত্তর প্রদেশে জারণ - টিকা, সংস্কৃতে তুম্বরু

এবং উড়িষ্যায় এ গাছটি টুন্ডোপোড়া নামে পরিচিত । গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম জেন্থোজাইলাম এলাটাম *(Zanthoxylum alatum)*, গোত্র রুটেসী ।

গাছটি ছোট ঝোপ হতে ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় । সর্বাধিক উচ্চতা ৮ মিটারের মধ্যে । সম্পূর্ণ কাণ্ড, শাখা প্রশাখা এমনকি পত্রবৃন্ত পর্যন্ত অসংখ্য শক্ত কাঁটার আবরণে আবৃত । পুরোনো শাখাগুলি শঙ্কব আকৃতির ও নীচের অংশটি সামান্য স্ফীত । পাতা যৌগিক সর্বদাই বেজোড় সংখ্যায় অর্থাৎ সচূড় পক্ষল । যৌগিক পাতার বৃন্তটি চ্যাপ্টা হয়ে পাখার ন্যায় প্রসারিত হয় । পত্রকের সংখ্যা পাঁচ থেকে সর্বাধিক তেরটি, তিন থেকে আট সেমি দীর্ঘ এবং এক থেকে তিন সেমি প্রস্থ, লেন্স আকৃতি বিশিষ্ট । ফলকের প্রান্ত দাঁতের ন্যায় খাঁজকাটা এবং পত্রকগুলোতে বৃন্ত থাকে না । ফুল অসংখ্য ১০ - ১২ সেন্টিমিটার দীর্ঘ গুচ্ছাকার পেনিকেল জাতীয় পুষ্পবিন্যাস সৃষ্টি করে । ফুলেব বর্ণ হলুদ, রোমাবৃত ও বিভিন্ন মিশ্র ফুল একই সাথে উৎপন্ন হয় । ফুলের কোন পাপড়ি নেই । বৃতিগুলি হলুদ বর্ণের হয়ে যায় । বৃতির সংখ্যা ৬-৮টি । পুংধানীর সংখ্যাও বৃতির সমান । ফল এক থেকে তিনটি গুচ্ছে বা কদাচিৎ চারটির গুচ্ছ সৃষ্টি করে । ফল ক্ষুদ্র গোলাকার, ড্রুপ জাতীয় এবং সম্পূর্ণ পেকে গেলে দুটি অংশে ফেঁটে যায় । ফলের বর্ণ লাল । বীজ চকচকে কালো ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

এই গাছের ফলে শতকরা ১.৫ ভাগ প্রয়োজনীয় তৈল থাকে । এতেপ্রধানত α - ফিলান্‌ড্রিন এবং কিছু পরিমাণে লিনালল থাকে । এছাড়া সামান্য উদ্বায়ী তৈল এবং কিছু রজন থাকে । কান্ডের বহিঃত্বকে একপ্রকার তিতা কেলাসিত বস্তু থাকে এবং এদের গঠন বার্বারিনের ন্যায় । এই উদ্ভিদ থেকে ঝাঁঝালো উদ্বায়ী তৈলের ন্যায় মৃদু দুর্গন্ধ ও কড়া ঝাঁঝালো স্বাদ অনুভূত হয় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

বিস্বাদ বলে কান্ডের বহিঃত্বক মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না বা মানুষও গৃহপালিত জন্তু এই গাছ খায় না । তবে বিভিন্ন জায়গায় মাছ মারার জন্য কান্ডের বহিঃত্বক জলে ফেলে দিলে কয়েক ঘন্টায় মাছ মরে ভেসে উঠে । মানুষের দেহে এই গাছের প্রভাবে তীব্র বুক ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, হৃদকম্প ইত্যাদি দেখা দেয় । পরবর্ত্তী পর্যায়ে হাত পায়ের শিথিলতা দেখা দেয় ও দেহ অবশ হয়ে আসে ।

চিকিৎসা

সেপোনিন থাকে বলিয়া গাছের রস বিষাক্ত ।তবে বিস্বাদ পাতা বলিয়া গৃহপালিত জন্তুরাও এই উদ্ভিদ এড়িয়ে চলে ।কোন কারণে পাতার রস পেটে গেলে দ্রুত বমি করানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সামান্য গরম জলে চিনি নুন খাওয়ার সোডা মিলিয়ে রিহাইড্রেশন দ্রবন তৈরী করে বার বার পান করাতে হবে ।

তুলা

গাছটি বহুল পরিচিত এবং প্রাথমিক জীবনধারণের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিনটি প্রধান প্রয়োজনীয়তার একটি তুলা গাছ থেকে পাওয়া যায় । এটির বৈজ্ঞানিক নাম গোসীপিয়াম হার্বেসিয়াম (*Gossypium herbacium*) এবং বাংলায় এটির অপর নাম কার্পাস তুলা। এটি গোত্র মালভেসী'র অন্তর্গত ।এই গাছটি মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অংশে ব্যাপক ভাবে চাষ হয় ।

উদ্ভিদগুলি দীর্ঘ, বিরুৎ জাতীয় বা ক্ষুদ্র গুল্ম বা ছোট ছোট বৃক্ষ জাতীয় ।পাতাগুলি তিন থেকে নয়টি খন্ড যুক্ত এবং বেশ বড় ও প্রসারিত । প্রতি পাতার নীচের দিকে একজোড়া করে মুক্ত পার্শ্বীয় উপপত্র বিদ্যমান ।গাছের পাতাগুলি রোমাবৃত এবং একটি করে ফুল প্রতিটি পুষ্প বৃন্তে উৎপন্ন হয় ।ফুলগুলি বেশ বড় হলুদ বা বেগুনী । প্রতিটি ফুলের নীচে তিনটি করে বেশ বড় মঞ্জরী পত্র বিদ্যমান ।এদের গায়ে কিছু কিছু কাল বর্ণের গ্রন্থি যুক্ত অংশ দেখা যায় ।ফুলে বৃতি পাঁচটি খণ্ড যুক্ত, দল নলাকার অগ্রভাগ পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত ।পুংধানী অসংখ্য এবং দন্ডগুলি সংযুক্ত হয়ে একটি স্তম্ভের ন্যায় গর্ভদন্ডকে আবৃত করে রাখে ।পুংধানী বৃক্কাকার ।গর্ভমুন্ড পাঁচটি এবং অগ্রভাগ চ্যাপ্টা গদাকৃতির ।গর্ভাশয় পাঁচটি প্রকোষ্ঠ যুক্ত ।ফল ক্যাপসুল জাতীয় এবং তিনটি থেকে পাঁচটি খন্ড যুক্ত ও সংযুক্তি বরাবরে পূর্ণাঙ্গ হবার পর ফেটে যায় । প্রতিটি বীজের গায়ে বহিঃত্বক থেকে নির্গত সাদা বা রঙীন অসংখ্য তন্তুর ন্যায় রোম থাকে এবং এরা বাণিজ্যিক তুলা রূপে ব্যবহৃত হয় ।

ব্যবহার

তুলা বীজের গায়ের তন্তু কাপড় তৈরীতে এবং সূতা, গদি, ইত্যাদিতে ব্যবহৃত। তুলার বীজ পশুখাদ্য রূপে ব্যবহৃত। গাছটির মূলের বহিঃত্বক এবং কাঁচা বীজ ঔষধে ব্যবহৃত। মূলের বহিঃত্বক থেতো করে আফ্রিকার মহিলারা গ্রামীন গর্ভপাতে ব্যবহার করে। বিজ্ঞানী ওয়াটের মতে এটি ইরগোমেট্রিনের ন্যায় জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে। তুলা বীজ থেকে নিষ্কাষিত তৈল গোলকৃমি নির্মূলে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

বিষাক্ত রাসায়নিক

তুলা মূলের বহিঃত্বক থেকে বর্ণহীন বা সামান্য ফ্যাকাশে সাদা বর্ণের রজন পাওয়া যায় এবং এটির পরিমাণ শতকরা আট ভাগ। এছাড়া মূলের বহিঃত্বক থেকে ডাই - হাইড্রোক্সি ব্যাঞ্জোয়িক অ্যাসিড, সেলিসাইলিক অ্যাসিড এবং দুটি ফিনল গঠিত যৌগ, বিটেইনীন, ফাইটোস্টেরল, সেরিল অ্যালকোহল ও কিছু পরিমাণ মিশ্র স্নেহ যুক্ত অ্যাসিড পাওয়া যায়। তুলা বীজে ০.০০৫৯ থেকে ০.০৫৩ শতাংশ ফিনল গঠিত যৌগ গোসিপল থাকে।

বিষাক্ততার লক্ষণ

তুলা বীজ থেকে উৎপন্ন খাদ্যে গোসিপল বিদ্যমান বলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষাক্ততার লক্ষণ প্রকাশ করে। প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে ক্ষিদা হ্রাস পাওয়া, তরল পায়খানা দেখা দেয় এবং রোগাক্রান্ত প্রাণীরা রোগা হয়ে ওজন হ্রাস পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফুসফুসে জল জমে শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। স্নায়ুগুলির সংবেদনশীলতা হ্রাস পায় এবং ধীরে ধীরে শরীরে অসাড়তা দেখা দেয়। পরীক্ষামূলকভাবে গোসিপল ইঞ্জেকশান দিয়ে দেখা গেছে যে বিষক্রিয়ার ফলে ফুসফুসে জল জমে।

চিকিৎসা

যেহেতু মানুষ তুলা বীজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেনা এবং গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে তুলা বীজ চূর্ণ করে খেতে দেওয়া হয় এজন্য রোগলক্ষনগুলি তাদের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। নিয়ন্ত্রিত পরিমানে তুলাবীজ চূর্ণ পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে জানা যায় যে খাদ্যের সাথে ফেরিক অক্সাইড সামান্য পরিমানে মিশিয়ে দিলে গেসিপল বিষক্রিয়ার লক্ষন প্রকাশিত হয় না। গৃহপালিত জন্তু বেশী পরিমানে তুলা বীজ খেয়ে নিলে রোগলক্ষন প্রকাশিত হলে পশুহাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে।

হিঙ্গন

গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম বেলানাইটিস রক্সবার্ঘি *(Balanites roxburghii)*, গোত্র সিমারোবেসী। বাংলা নাম হিঙ্গন।

গাছটি সারা ভারতে বিস্তৃত এবং পাঞ্জাব থেকে সিকিম মধ্যভারত হয়ে কেরল পর্যন্ত বিস্তৃত। আরবী ভাষায় এর নাম এলহেজিক হিংগার, হিংগোরিও ইত্যাদি। হিন্দিতেও এর অনেক নাম যেমন - হিংগন, হিংগল, হিংগট, ইংগোয়া, আরো অনেক। মালয়ালম ভাষায় এর নাম নানচুন্টা। কানাড়ী ভাষায় ইংগালারাডী, ইংগালুক্কী ইত্যাদি। মারাঠী ভাষায় এটিকে হিংগন বা হিংগনী বলে। সংস্কৃত ভাষায় এর নাম ইংগোদী আবার তামিল ভাষায় এর নাম টরুভাট্টু। তেলেগু ভাষায় এর নাম গারাপান্ডু বা ইংগোদী বা রিংরী, উড়িয়া ভাষায় এর নাম ইংগোদী - হালা এবং উর্দুতে একে ইরগেট বলে।

গাছটি প্রায় দশ মিটার উঁচু, চিরহরিৎ বৃক্ষ। কান্ডের গায়ে বেশ শক্ত কাঁটা থাকে। কাঁটা থেকে অনেক সময় জোড়ায় জোড়ায় পাতা বের হয় এমনকি কাঁটার উপরও ফুল আসে। পাতা গুলি যৌগিক, জোড়ায় জোড়ায় থাকে। অনেকটা ডিম্বাকৃতির এবং তিন সে.মি. দীর্ঘ ও দেড় সেন্টিমিটার প্রসারিত থাকে। গাছের ফুলগুলি প্রাথমিক অবস্থায় সবুজাভ কিন্তু ভেতরের দিকটি কমলা বর্ণের বা গোলাপী বর্ণের। ফুলগুলি নিয়ত। পাপড়ির বাহিরের দিকটি চক চকে কিন্তু ভেতরের দিকটিতে সিল্কের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তু থাকে। ডিম্বাশয়টি লেবুর ন্যায়, অর্ধনিমজ্জিত। ফল পাঁচ সে.মি. পর্যন্ত দীর্ঘ, ডিম্বাকৃতির এবং পাঁচটি পাতলা দাগ এটির গায়ে বিদ্যমান। ফল এবং বীজের গন্ধ একেবারেই বিশ্রী।

ব্যবহার

রাজস্থানে সিল্ক ধৌত করার জন্য ফল থেতু করে রসটি ব্যবহার করা হয়। বীজগুলির আবরণ ছাড়িয়ে গানপাউডারের সাথে মিশিয়ে পটকা বানানো হয়। গ্রামীণ ঔষধে গাছের ফল বীজ, কান্ডের বহিঃত্বক এবং পাতা কফের ঔষধ তৈরীতে কৃমির ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বীজ থেকে যে তৈল পাওয়া

যায় তা কুষ্ঠ- কাঠিন্য দুরীকরণে ব্যবহৃত হয় । এছাড়া ফলের অংশ থেকে এক প্রকার নেশাকারক তাড়ি তৈরী হয় । মাছ মারা বিষ রূপে এই গাছটির ব্যবহার সারা পৃথিবীতেই প্রচলিত ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

এই গাছের ফলে শতকরা সাত ভাগেরও বেশী সেপোনিন পাওয়া যায় । এছাড়া কিছু পরিমাণে কোয়াসিন, কেম্ফিলামারিন এবং কিছু গ্লুকোসাইড ফলে থাকে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

কাঁটা যুক্ত গাছ বলে গৃহপালিত জন্তুরা এটি খায় না । এই গাছ তাড়ি তৈরীতে ব্যবহৃত হয় বলে অনেক সময় গাজনের পর বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রভাবে নেশার তীব্রতায় স্নায়ুতন্ত্র অসাড় হয়ে থাকে এবং তরল পায়খানা হতে পারে এমনকি শরীরে খিঁচুনী দেখা দিতে পারে ।

চিকিৎসা

এই গাছের ফল মদ তৈরীতে ব্যবহৃত হয় যা একেবারেই উচিত নয় । স্নায়ুর উত্তেজনা অস্থিরতা ইত্যাদি দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত । জোলাপ হিসাবে এই গাছ থেকে উৎপন্ন তাড়ি খেয়ে অসুস্থতা দেখা দিলে দ্রুত পাকস্থলী ধৌত করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

বার্নিস গাছ

এই গাছটির বিভিন্ন নাম যেমন চীন দেশীয় সোমাক, ঝাঁঝালো সীডার, বার্নিস গাছ ইত্যাদি । এটি একটি বিশাল বৃক্ষ কিন্তু শীতকালে তার সমস্ত পাতা খসে পরে । এটির বৈজ্ঞানিক নাম এইলেন্থাস অল্টিসিমা *(Ailanthus altissima)*, গোত্র সিমারোবেসী। গাছটির পাতা যৌগিক প্রায় তিন মিটার দীর্ঘ এবং মধ্যশিরার দুইপার্শে অসম পত্রক সজ্জিত । প্রতিটি পত্রকের দুই পার্শ্বে এক থেকে তিন জোড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃদ্ধি দেখা যায় এবং এদের নীচের দিকে গ্রন্থি কোষ থাকে । মূলে অসংখ্য মূল

চোষক থাকে । ফুলগুলি ক্ষুদ্র এবং ভেতরে নরম তন্তুর ন্যায় বা তুলার ন্যায় রোম দেখা যায় । পাপড়িতেও রোম বিদ্যমান । পুংধানীর পুংদণ্ড গুলি বাইরের দিকে ছড়িয়ে থাকে এবং পুংধানীর নিম্ন অংশটি প্যাঁচানো ।

এই গাছটি ইউরোপে রাস্তার ধারে ছায়ার গাছরূপে লাগানো হয়। জাপানেও এই গাছটি পাওয়া যায় । উত্তর ভারতের কিছু অঞ্চলের পাহাড়ে এই গাছটি এখন লাগানো হয়েছে ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

গাছের কান্ডের বহিঃত্বকে এইলোফাস নামে অতি তেঁতো স্ফটিকের ন্যায় দানাদার বস্তু পাওয়া যায় । এছাড়া ক্যাস্টিলিন, সামাডেরিন ইত্যাদি গ্লুকোসাইড, পিক্‌রাসমিন, সিমারবিন ইত্যাদি সেপোনিন পাওয়া যায় । ফুলে এক ধরণের তৈল পাওয়া যায় ।

ব্যবহার

কান্ডের বহিঃত্বক কীটনাশক রূপে ব্যবহৃতহয় । গাছের ছাল জলে ভিজিয়ে রেখে চব্বিশ ঘন্টা পর এই জল খাওয়ালে কৃমি নাশ হয় এমন তথ্য কবিরাজী চিকিৎসায় ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

কান্ডের বহিঃত্বকের পাউডারের গন্ধ বমির উদ্রেক করে এবং খেলে নেশার ন্যায় কাজ করে । এটি স্নায়ুতন্ত্রের উপর তামাকের ন্যায় ক্রিয়া করে । ফুলের তীব্র গন্ধ অনেক সময় নেশার উদ্রেক করে । এই গাছের ডালপালা নাড়াচাড়া করলে গায়ে চুলকানী হয় এবং এই গাছের পাতা কূয়ার জলে পড়ে গেলে সেই জল পান করলে তীব্র তরল পায়খানা ও পেটের গন্ডগোল হয় । এই গাছের কান্ডের বহিঃত্বক মাছ মারার বিষরূপে পরিচিত।

চিকিৎসা

পুকুর বা কুয়ায় যাতে এ গাছের পাতা না পরে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । পেটের গণ্ডগোল দেখা দিলে ইলেকট্রোলাইট দ্রবন প্রচুর পরিমানে পান করাতে হবে । ঔষধ রূপে ব্যবহারের সময় এ গাছের বহিত্বক পরিমানে অধিক যাতে না হয় সেদিকেও সাবধানে তা নিতে হবে ।

লতা ফট্‌কী

এই গাছটি একবর্ষজীবী লতানো এবং ভারতের সমতলের বেশীর ভাগ অঞ্চলে পাওয়া যায় ।আরবী ভাষায় এই গাছটির নাম হ্যবউল কলকল ।বাংলায় এটিকে শীত ঝুল, নুয়াফোট্‌কী ইত্যাদি বহু নামে ডাকা হয় ।বার্মায় এটিকে মালামাই, গুজরাটে কারোলীয়, কানাড়া ভাষায় কারা লতা বা কংগু বা ইরুমালী ।মালয়ালম ভাষায় একে জ্যোতিষমতী বা কাটাভী বা উলিন্না বলে ।মারাঠী ভাষায় এর নাম কানফুটি, কাপালাফুটি এবং মহারাষ্ট্রে এর নাম বোধা, নাফাট বা শিবং জল এবং তামিল ভাষায় এটির নাম কোট্রাভাল, মোডাকাট্রান, পেরিইয়াইলাম - মোডাকাট্রান সামাটিরাডয়ান, সিলিইয়ানাই, সুগাট্রান ইত্যাদি বহু নামে এটি পরিচিত ।তেলেগু ভাষায় এর নাম এক্কুডু - টিগি, জ্যোতিষমতী টিগী ইত্যাদি; সংস্কৃতে একে জ্যোতিষমতী, করোভী বলে ।এটির বৈজ্ঞানিক নাম কার্ডিওস্পার্মাম হেলিকেকেবাম *(Cardiospermum helicacabum)*, গোত্র সেপিনডেসী । ইংরেজীতে একে বেলুনভাইন বা উইনটার বেরী বলে ।

গাছটি লতানো, পাতলা, অতিক্ষুদ্র রোম যুক্ত চক্‌চকে, পাতাগুলি যৌগিক এবং পত্রক বেশ সরু, দীর্ঘ, বসন্তকালে ভারতের প্রায় সমস্ত সমতল জায়গায় এবং হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত গাছটি বিস্তৃত । কদাচিৎ পরাশ্রয়ী, পুষ্প বিন্যাসের প্রান্তে বা শাখায় আকর্ষ থাকে ।ফুলগুলি ক্ষুদ্র নিয়ত, সাদা বর্ণের এবং ১০ সেন্টিমিটার ব্যাস যুক্ত ।ফল চ্যাপ্টা, ক্যাপসিউল জাতীয় এবং প্রান্তগুলি পাখার ন্যায় বিস্তৃত ।বীজ গাঢ় কাল বর্ণের এবং বীজের আকৃতি হৃদপিন্ডের ন্যায় ও সাদা বর্ণের আঁশ থাকে ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণে সেপোনিন থাকে ।এটির কিছু কিছু জাতে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড পাওয়া যায় ।

ব্যবহার

এ গাছের পাতা এবং মূল গ্রামীণ ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয় ।এছাড়া

মূল থেতু করে খাওয়ালে পাকস্থলীর ব্যথা কমে যায় । এটি কুষ্ঠ কাঠিন্য দূরীকরণে এবং আমাশয়ে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় রোগের উপসম ঘটায় । গেটে বাতে এটি ব্যবহৃত হয়।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

ঔষধে ব্যবহারের সময় পরিমাণের অধিক এ গাছের পাতা সেবনে তীব্র তরল পায়খানা হতে থাকে, গা গোলায় এবং বমির ভাব হয় । হাত পায়ে খিল ধরে ।

চিকিৎসা

রোগলক্ষণ দেখা দিলে প্রচুর পরিমানে ঘরে তৈরী ইলেকট্রোলাইট (এক লিটার ঈষদোষ্ণ জলে এক চামচ লবন, ৭-৮ চামচ চিনি বা গুড় এবং এক চিমটি খাওয়ার সোডা) পান করাতে হবে । বিশেষ অসুবিধা দেখা দিলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে । ঔষধে ব্যবহার করার সময় অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করতে হবে । যেহেতু গাছে সেপোনিন বিদ্যমান এজন্য এই গাছ যাতে মৎস্য চাষের পুকুরে না ফেলা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । নাহলে পুকুরের সমস্ত মাছ মারা যাবে।

লাল পোস্ত

কাশ্মীরের বিখ্যার্ত লাল পোস্ত উত্তর ভারতের ঠান্ডা অঞ্চলের বাগানে চাষ করা হয় । আরব দেশে এটির নাম খাসখাসুল সোডা । হিন্দিতে একে লাল বা লালা পোস্তা, বার্মায় ভিন - বিন - আমি, দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটে এটির নাম লাল খস্‌খস, কানাড়া ভাষায় কেম্পু গসগসী, পার্শ্বীয়ান ভাষায় এটি গুলেলতা, মালয়ালমে চুবানা - খসহ - খস, মারাঠী ভাষায় টাম্বাডা, সংস্কৃতে রক্ত পোস্ত উর্দুতে গুলে লতা এবং তেলেগুতে এর নাম ইর্‌রা - ঘস - ঘসালা, ইংরেজীতে এর নাম কর্ণপপি বা পয়জন পপি বা রেড পপি এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম পেপাভার রোইয়াস *(Papaver rhoeas)* গোত্র পেপাভারেসী ।

গাছটি পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার দীর্ঘ । বেশ শাখা যুক্ত গুচ্ছ

তৈরী করে । পাতাগুলি যৌগিক এবং দুটি করে জোড়ায় জোড়ায় থাকে । পাতার খন্ডকগুলি খাঁজ কাটা এবং অগ্রভাগটি সরু, দীর্ঘ, সূচালো । পুষ্প দন্ডের গায়ে বহু রোম বিদ্যমান । ফুলগুলি একক । পাঁচ থেকে সাত সেন্টিমিটার ব্যাস যুক্ত । লাল থেকে স্কার্লেট বর্ণের কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশটা অতীব গাঢ় । পাপড়িগুলি তন্তুজ, ফল ক্যাপসুল জাতীয়, গোলাকার বা ডিম্বাকার, চক্চকে মসৃণ, গর্ভদ গুের অগ্রভাগটি আট থেকে দশটি রশ্মির ন্যায় অংশ ধারণ করে । গাছ ও ফলের গাত্রে প্রচুর পরিমাণে চটচটে আঠালো তরুক্ষীর থাকে ।

ব্যবহার

এ গাছটির ফলের তরুক্ষীর নেশাকারক বস্তু রূপে ব্যবহৃত হয় ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

রোয়েডিন নামক এক প্রকার এলকালয়েড পাওয়া যায় । তবে এর বিষাক্ততার তীব্রতা ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হয় নি । ক্যাপসুলের গাত্রে মরফিন, পেরামরফিন, নারকোটিন নামক বিষাক্ত যৌগ থাকে ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

গৃহপালিত পশুরা এ গাছ খেলে পেটে তীব্র ব্যথা দেখা দেয় । এছাড়া কুষ্ঠ- কাঠিন্য, প্রাণীদের পায়ের জোড় কমে আসে, ফলের গাত্রে তরুক্ষীর থেকে প্রাপ্ত এলকালয়েড অ্যাসিড এর ন্যায় ক্রিয়া করে । প্রথমতঃ দেহের স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে গাঢ় নিদ্রা থেকে কোমা দশার মাধ্যমে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে । বেশী পরিমাণে মরফিনের ক্রিয়ায় সংবহন তন্ত্র ব্যহত হয় বলে গৃহপালিত জন্তু যথা গরু, গাধা, ঘোড়া ইত্যাদি উঠে দাঁড়াতে পারে না । ধীরে ধীরে মৃত্যু চলে আসে ।

চিকিৎসা

রোগলক্ষন দেখা দিলেই খুব দ্রুত ১ শতাংশ পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবন দ্বারা পাকস্থলী ধৌত করে দিতে হবে । যেহেতু শ্বাসক্রিয়া খুব দ্রুত বন্ধ হয়ে আসে এজন্য শ্বসন উদ্দীপক হিসাবে এট্রোপিন, স্ট্রিকনিন ইত্যাদি ইনজেক্শন ও কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে হবে । হাসপাতালে এসকল চিকিৎসা চলাকালীণ খেয়াল রাখতে হবে রোগী যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে ।

কাষ্ঠমালি

মোটামুটি আট থেকে দশ মিটার উঁচু বহু দ্যাগ্র শাখাযুক্ত, বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ । শাখার অগ্রভাগগুলি চকচকে এবং তৈলাক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত । পাতাগুলি বেশ বড় এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের । উপরিতলে দশ থেকে বাইশ জোড়া মধ্যশিরার পাতা দেখা যায় । পত্রবৃন্তগুলি ছোট এবং শাখার অগ্রভাগে ফুলগুলি গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয় । ফুলের গন্ধ মনমাতানো, দল নীচের দিকে যুক্ত কিন্তু উপরিভাগ প্রসারিত, সর্পিলাকারে প্যাচানো । বীজের চারদিকে দৃঢ় আবরণযুক্ত ফল উৎপন্ন হয় ।

গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম টেবার্নামন্টানা ডাইভেরিকাটা (*Tabernamountana divariecata*) । গোত্র অ্যাপোসাইনেসী । মুসলমানরা একে এডেন এর নিষিদ্ধ ফল বলে থাকে । ইংরেজরা এর নাম দিয়েছে ইভ এর আপেল গাছ । গাছটি প্রচন্ড বিষাক্ত এবং এর থেকে নির্গত তরুক্ষীর আরো বেশী বিষাক্ত ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

সর্বাধিক বিষাক্ত এবং শারীরবৃত্তীয় ভাবে কার্যকরী যৌগ হল টেবার্নিমন্টানাইন এবং কোরোনারাইন ।

ব্যবহার

এই গাছটির বীজ চূর্ণ করে দুধের সাথে মিশিয়ে নেশা করা হয় যার ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতি, বিকারগ্রস্ততা দেখা দেয় বা প্রবল উত্তেজনা অনুভূত হয় । কোন কোন জায়গায় কুষ্ঠবদ্ধতা দুরীকরণে এ গাছের পাতা থেতো করে খাওয়ানো হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের রসও বাহ্য পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

নেশা করতে গিয়ে মস্তিষ্কের বিকৃতি, বিকারগ্রস্থতা দেখা দেয় । প্রবল উত্তেজনায় শরীরে কম্পন দেখা দেয় এবং নেশার বস্তু পরিমাণে বেশী হলে মৃত্যু ঘটে ।

চিকিৎসা ঃ

খুব দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে । কম্পন রোধ করার জন্য স্নায়ু শীতলকারী ঔষধ (ডাইজিপাম জাতীয় টেবলেট) দিয়ে অতি দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা উচিত ।

হিজল

"হিজল বিছানো বন পথ দিয়া
রাঙ্গায়ে চরণ আসিবে গো প্রিয়া"—

হিজল ফুল আর গাছ সম্পর্কে কবির মনের উজার করা ভালবাসার অভিব্যাক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পনেরো মিটার উঁচু এই গাছটি । বাংলার প্রায় সর্বত্র এগাছটি বিস্তৃত । এ গাছটির অপর নাম হিংজিল, কুমিয়া । হিন্দিতে এটিকে ইন্‌জার, ইজার বলে। মালয়ালম ভাষায় এর নাম আটাম্বু বা নিরপেরা, আট্টোপেরা ইত্যাদি । মারাঠী ভাষায় এটি হল ডেটিফল বা নিভার বা টুভার গাছ । সংস্কৃতে এর নাম হিজ্জালা বা নিচুলা । সাঁওতালরা একে বলে হিনজর এবং উড়িষ্যায় কিনজল, হিনজল ইত্যাদি । তামিল ভাষায় এটি হলো এডাম্পা আব উর্দু ভাষায় সমুন্দর ফল । গাছটির ইংরেজী নাম ইন্ডিয়ান ওক এবং বৈজ্ঞানিক নাম ব্যারিংটোনিয়া একুইটেঙ্গুলা (***Barringtonia acutangula***), গোত্র মিরটেসী।

14

সারা ভারতে এ গাছটি প্রায় সর্বত্র সমতলের ভিজা জায়গায় বা নদীর পারে বিস্তৃত । পাতা আট থেকে বারো সেন্টিমিটার দীর্ঘ, নীচের দিকটি সরু কিন্তু উপরিভাগ ডিম্বাকার । পাতার ফলকের প্রান্তগুলি ছোট্ট ছোট্ট দাঁতের ন্যায় অমসৃণ । পাতার বৃন্ত ক্ষুদ্র, পাতাগুলি সরল। প্রতিটি পাতায় একটি করে মধ্যশিরা থাকে । ফুলগুলি দীর্ঘ মুঞ্জুরীদন্ডে নীচের দিকে ঝুলে পড়ে । প্রতিটি ফুল প্রায় এক সেন্টিমিটার ব্যাস যুক্ত এবং বর্ণ গোলাপী । বৃতি চারটি, সবুজ, স্থায়ী । দল চারটি, পুংধানী অসংখ্য । ডিম্বাশয় দ্বিকোষী । ফল প্রায় দুই সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং এক সেন্টিমিটার ব্যাস যুক্ত । চতুস্কোণাকার ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

দুটি বিশেষ ধরণের সেপোনিন এই গাছে পাওয়া যায় । তাদের মধ্যে রক্ত কোষ ভেঙ্গে দেওয়ার বৈশিষ্ট্য বর্তমান । উদ্ভিদে বিভিন্ন তারপিন যেমন পিনেইন, সিনিয়ল, এলকোহল যথা জিরানিয়ল, মিরটিনল, কোরওফাইলিন ইত্যাদি থাকে ।

ব্যবহার

এ গাছের পাতা, ফল , বীজ মূল কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয় । গাছটির পাতা বিষাক্ত নয় কিন্তু ঝরে পরা ফুল থেকে নোনা ধরা গন্ধ বের হয় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

গন্ধের জন্য কারোর ক্ষেত্রে বমি বমি ভাবও দেখা দয় । মানুষের ক্ষেত্রে এটি তীব্র ক্ষতিকারক নয় শুধু গা গুলানো , মাথা ব্যথা ইত্যাদি দেখা দেয় ।

চিকিৎসা

লক্ষন অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে । রোগীকে মুক্ত বাতাসে রাখতে পারলে মাথা ধরা এবং মাথা ঘোরানো ধীরে ধীরে কমে আসে । ডাক্তারের কাছে দ্রুত নিয়ে যাওয়ার মতন উল্লেখযোগ্য রোগ এ গাছ থেকে হয় না । কিছু কিছু মানুষ বেশী সংবেদী । তাদের এসব গাছ সর্বদাই এড়িয়ে চলা উচিত ।

ঝাউ

উদ্যানশোভাকারী উদ্ভিদরূপে ঝাউ পৃথিবীর সর্বত্র চাষ করা হয় । ব্যবসায়িক ভিত্তিতে থুজা চাষ করে বহু পরিবার বেঁচে আছে । সরাসরি এ গাছের ফল বাচ্চারা মুখে দেয় না । কারণ শক্ত চাকচিক্যহীন এ ফল কাউকে আকর্ষণ করে না । পাতা গুলিও শল্কপত্রের ন্যায় । তাই এ গাছ থেকে মানুষের সরাসরি বিষাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম । তবে এ গাছ থেকে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয় যা চামড়ার উপর তীব্র জ্বলন সৃষ্টি করে এবং ঘা দেখা দেয় । এ গাছটি ব্যক্তবীজি উদ্ভিদের অন্তর্গত এবং বৈজ্ঞানিক নাম থুজা অক্সিডেন্টেলিস *(Thuja occidantalis)* এবং ইংরেজী নাম শ্বেতসিডার। গোত্র কিউপ্রেসেসী ।
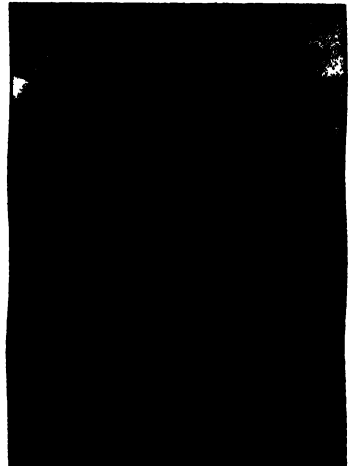
থুজা ক্ষুদ্র বৃক্ষজাতীয় কাষ্ঠল উদ্ভিদ । এটি বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে । তাই পাথুরে মাটি থেকে পশ্চিম ভারতের কালচে মাটি এবং এখানকার লাল মাটিতেও জন্মায় । গাছটির সর্বাধিক উচ্চতা প্রায় বিশ মিটার কিন্তু ছেটে রেখে এর আকৃতি খর্ব রাখা হয় ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

প্রধান বিষাক্ত রাসায়নিক মনোটারপিন থোজেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

শল্কপত্রের ন্যায় পাতাগুলি চিবুলে এক প্রকার তৈল বেরিয়ে আসে । এই তৈল মুখের শ্লেষ্মা ঝিল্লীতে প্রচন্ড জ্বলন তৈরী করে । ধীরে ধীরে মুখের অভ্যন্তরে ঘা দেখা দেয় । এই ঘা দীর্ঘস্থায়ী এবং কোন অসুধেই ভাল হতে চায় না । এই তৈলের তীব্র বিষের প্রভাবে লিভারের কোষগুলি নষ্ট হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে লিভারের সিরোসিস দেখা দেয় । শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে দীর্ঘ স্থায়ী কম্পন দেখা দেয় । ধীরে ধীরে মূত্রনালীতে প্রচন্ড জ্বালা ও কিডনী নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয় । পাকস্থলীর অভ্যন্তরের প্রাচীর থেকে রক্ত বেরুতে থাকে এবং ফলে দ্রুত দুর্বলতা দেখা দেয ।

চিকিৎসা

বিষক্রিয়ার লক্ষন প্রকাশিত হওয়া মাত্র খুব দ্রুত পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া বিশেষ প্রায়োজন । পুরনো কয়লার সক্রিয় চারকোল পাউডার খাইয়ে দেওয়া যেতে পারে । এছাড়া হাসপাতালে নেবার আগে নুন জল খাইয়ে বা যেকোন ভাবে বমি করানো উচিত । কম্পন শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি দেখা দিলে লক্ষন অনুযায়ী চিকিৎসা কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে করতে হবে ।

জুনিপার

ইউরোপের জংলী গাছ জুনিপার বর্ত্তমানে নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের বহু অঞ্চলে বিস্তৃত । পাইন গাছের জঙ্গলে এরা বিশেষ ভাবে জন্মায় । ভারতের হিমালয় অঞ্চলে জুনিপার গাছের কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায় । এ ছাড়া সুন্দর গাছ হিসাবে টবে চাষ করা হয় । এদের স্ত্রী এবং পুরুষ গাছগুলি সম্পূর্ণ আলাদা হলেও আকৃতিগতভাবে একই প্রকার । স্ত্রী গাছের ফুলে গোলাকার রেণুপত্র মঞ্জরী গুলি ফলের ন্যায় দেখা দেয় । এই ফলের ন্যায় অংশগুলি কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ কিন্তু

পেকে গেলে পিঙ্গল কালো বর্ণের আকৃতি ধারণ করে । ফল সদৃশ রেণুপত্র মঞ্জরী হইতে বিষাক্রান্ত হবার ঘটনা বিরল কারণ সূঁচের মতো পাতা বলে পশুরা এ গাছ মুখে নেয় না আর পাকা রেণুপত্র মঞ্জরী স্বাদ নয় বলে এটি সাধারণতঃ কেউ খায় না । তবে গাছ থেকে পাওয়া তৈল অসুধ হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে তীব্র বিষক্রি য়ায় মৃত্যুর ঘটনা কয়েকটি ক্ষেত্রে জানা গেছে ।
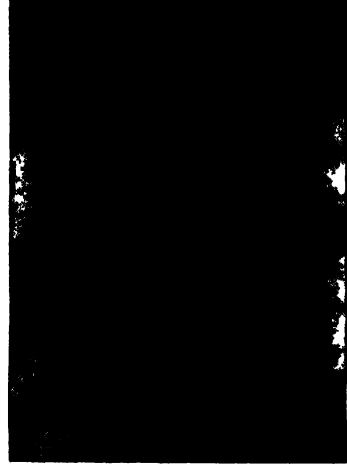
গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম জুনিপেরাস কমিউনিস *(Juniperous communis)*, গোত্র কিউপ্রেসেসী এবং এরা বৈশিষ্টগতভাবে ব্যক্তবীজি অর্থাৎ বীজগুলি ফলের ভেতরে থাকে না । এ জাতীয় উদ্ভিদে ফলই হয় না । গাছের উচ্চতা প্রজাতি ও অঞ্চল অনুযায়ী আলাদা । জুনিপেরাস কমিউনিস প্রজাতিটি শায়িত কিন্তু শাখাগুলি উর্দ্ধমুখি উলম্ব । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা পর্ব থেকে বেরিয়ে আসে । পাতা অত্যন্ত দৃঢ় এবং অগ্রভাগ সূচের ন্যায়, গাঢ় সবুজ বর্ণের । রেণুপত্রগুলি দৃঢ়ভাবে সজ্জিত হয়ে গোলাকার ফলের ন্যায় ধারণ কবে যা দেখতে অনেকটা বেতফলের ন্যায় দেখায় । স্ত্রী গাছে রসালো সুন্দর ফলের ন্যায় রেণুপত্রগুলি গুচ্ছাকারে থাকে । এরা বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাগানের বিস্তৃত অঞ্চলের শোভা বর্দ্ধন করে ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

তারপিন জাতীয় যৌগ মিশ্রিত প্রয়োজনীয় তৈল, আলফা পাইনিন এবং টারপিনিনল বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

অল্পপরিমাণে তারপিন জাতীয় এ তৈল কুষ্ঠকাঠিন্যে জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু পরিমাণ অধিক হলে মূত্রথলীর অন্তত্বক এবং মূত্রনালীর অভ্যন্তর ফোলে উঠে । গ্রামাঞ্চলে গোপন গর্ভপাতের জন্য এই তৈল ব্যবহৃত হয় যা সংবাহী স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে ও নষ্ট করে দেয় ।

জুনিপারের অপর একটি প্রজাতি জুনিপেরাস সেবিনা (Juniperus

sabina L)আমাদের দেশের প্রায় সব বাগানে চাষ করা হয় । এরা জংলী গাছ হিসাবে ইউরোপের পাহাড়ী অঞ্চলে বিস্তৃত হলেও অষুধী রূপে এ গাছকে বহু জায়গায় চাষ করা হতো । এটি বহুবছর বেঁচে থাকা গম্বুজের ন্যায় আকৃতি ধারণকারী বহুশাখাযুক্ত উদ্ভিদ । নূতন পাতা গুলি ছোট্ট সূঁচের ন্যায় ধারালো কিন্তু পুরনো পাতা শল্কের ন্যায় ও নরম । ছোট্ট ডালপালাগুলিও কাষ্ঠল । গাছ শায়িতও হতে পারে তবে এ গাছের মধ্যে তীব্র কটু গন্ধ বর্ত্তমান ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

সেভিন নামক এক প্রকার তীব্র বিষাক্ত যৌগ এই প্রজাতির জুনিপারে পাওয়া যায় । এটি তৈল হিসাবে উৎপন্ন হয় এবং তারপিন তৈলের উপযৌগ হিসাবে সেবিনিন এবং সেবিনাইল এসিটেট পাওয়া যায় । পোডোফাইলোটক্সিন শল্কপত্রে পাওয়া যায় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

গ্রামাঞ্চলে গোপন গর্ভপাতের জন্য বহুক্ষেত্রে সেভিন তৈল ব্যবহারের ঘটনা এবং তারপর বিষক্রিযায় মৃত্যু প্রায়ই হয়ে থাকে । ইউটেরাসে সেবিন তেল প্রয়োগে খুব দ্রুত ঐ অঞ্চলের কোষগুলিতে তীব্র কম্পন দেখা দেয় । ধীরে ধীরে স্নায়ু কোষগুলি সেভিনের প্রভাবে অসাড় হতে থাকে ও কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্র বিনষ্ট হয়ে যায় । চামড়ায় সেভিন তৈল মেলানিন নষ্ট করে শ্বেতী সৃষ্টি করে । বেশী পরিমাণ প্রয়োগে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘ চিকিৎসায়ও সুফল পাওয়া যায় না ।

চিকিৎসা

এই গাছ থেকে সরাসবি বিষাক্রান্ত হবার ঘটনা বিরল । যারা এ গাছের কাটিং বা লেয়ারিং করেন তাদেব প্রায়ই রোগলক্ষন দেখা দেয় এবং চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি হয় । তাই এসব কাজ করার সময় হাতে দস্তানা ব্যবহার জরুরী । কোন ভাবে সেভিন তেল মুখে গেলে খুব দ্রুত মুখ ধুয়ে ফেলা উচিত । পাকস্থলীতে গাছে থেঁতো অংশ গেলে যত দ্রুত সম্ভব কার্যকরী কয়লা পাউডাব বা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে বমি করাতে হবে । কম্পন কমানোর জন্য ডাইজ্জীপাম বা এলপ্রাজোলাম টেবলেট রোগীকে খাইযে দ্রুত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করাতে হবে । না হলে লিভারের কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে লিভারের কোষে ক্ষত হতে পারে ।

রোডোডেনড্রন

রবীন্দ্র সাহিত্যে রোডোডেনড্রনের বহু বর্ণনা পাওয়া যায় । গ্রীক ভাষায় একে গোলাপ গাছ বলে । অপূর্ব সুন্দর সুগন্ধী ফুলের জন্য রোডোডেনড্রন বিখ্যাত। ভারতের হিমালয়ের এবং এশিয়ার অন্যান্য পর্বত মালা, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা ইত্যাদি অঞ্চলে এ গাছটি বিস্তৃত । বৈজ্ঞানিক নাম রোডোডেনড্রন ক্যাম্পানোলেটাম (*Rhododendron campanulatum*)

চিরহরিৎ বেশ বড় গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ শাখার প্রান্তে ৩ - ৫ টি বড় বড় পাতা অর্ধচন্দ্রাকার বা বিডিম্বাকার আকৃতির । উপরিতল তৈলাক্ত, নিম্নতল বহুরোমযুক্ত। রোম গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের । ফুলগুলি প্রায় ৩ সে.মি. লম্বা হাল্কা বেগুনী অথবা সাদাটে গোলাপী দল যুক্ত হয়ে নলের ন্যায় গঠন সৃষ্টি করে এবং সামনের দিকটা কলসির ন্যায় বিস্তৃত, পাঁচটি খন্ডক যুক্ত । পুংকেশর ১০টি, ফল নলাকার ক্যাপসিউল গঠন করে এবং ২.৫ সেমি পর্যন্ত দীর্ঘ হয় । সাধারণত ফল বক্র ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

এন্ড্রোমিডোটক্সিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক যৌগ পাওয়া যায় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল যখন জলের অভাবে অন্যান্য ঘাস শুকিয়ে আসে এবং অন্যান্য গাছ প্রায় থাকেই না তখন গৃহপালিত পশুরা রোডোডেনড্রনেব কঁচি পাতা খেয়ে অনেকেই মারা যায় । পশুদের ক্ষেত্রে পেটে তীব্র ব্যথা, অস্থিবতা, দাঁত করমর করা, মুখ দিয়ে লালা পড়া, কিছুক্ষণ পবে বমি, পাতলা পায়খানা হতে থাকে। বাচ্চাদের শরীরে তীব্র কম্পন দেখা দেয । শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে পবে মাব যায় । ঘোড়াব ক্ষেত্রে চোখগুলি রক্তবর্ণ

হয়ে যায়, শ্বাস প্রশ্বাস অতি দ্রুত হয়ে যায় । তীব্র ঠান্ডা বোধ হতে থাকে এবং হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যায় ।

এন্ড্রোমিডোটক্সিন মানুষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিষাক্ত এমনকি একোনাইট বা এমিটিনের চেয়েও বেশী । এটি ভেগাস নার্ভের উপর ক্রিয়া করে যা প্রথম উদ্দীপিত হয় এবং পরে অসাড় হয়ে পরে । স্বনিয়ন্ত্রিত পেশীর শিরার প্রান্তগুলি অসাড় হয়ে যাওয়ার জন্য পেশী কার্যক্ষমতা হারায় এবং শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দ্রুত মৃত্যু ঘটে । এটি রক্তবাহী নালিকাকে সামান্য সংকোচিত করে ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় । গুরুমস্তিষ্কের কলাতে ক্রিয়া করে এটি নেশা গ্রস্থের·মত অবস্থা উৎপন্ন করে । সামান্য বেশী পরিমাণে এন্ডোমিডোটক্সিন দ্রুত মৃত্যু ঘটায় । এর দ্বারা মানুষ বা প্রাণী সরাসরি আক্রান্ত হয় না কারণ এ গাছ সহজলভ্য নয় ।

ভারতবর্ষে রোডোডেনড্রনের ৪৫ টি প্রজাতি পাওয়া যায় । এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটির বিষাক্ততা প্রমাণীত হয়েছে; বাকীগুলি নিয়ে গবেষণা অসম্পূর্ণ । অপর বিষাক্ত প্রজাতি রোডোডেনড্রন আরবোরিয়াম এবং . সিনাবোরিয়াম । শেষ উক্ত প্রজাতিটি জ্বালানী কাঠ হিসাবে প্রচুর ব্যবহৃত । এমনকি জ্বালানী কাঠের ধোঁয়া চোখে লাগলে চোখ ও মুখ ফোলে উঠে । এইজন্য এর কাঠ জ্বলাতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন ।

চিকিৎসা

খুব দ্রুত পেট পরিস্কার করার জন্য বেশী পরিমানে জোলাপ প্রয়োগ করতে হবে । তলপেটে ব্যাথা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাথা নিবারক ঔষধ দিতে হবে । দূর্বলতা কমানোর জন্য গরম দুধ, টনিক ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে । তীব্র বিষাক্ততা দেখা দিলে অতি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ।

তিসি

একবর্ষজীবী এই বীরুৎ জাতীয় গাছটি হিন্দিতে অলসী এবং সংস্কৃতে আটাসী নামে পরিচিত । গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম লাইনাম উসিটাটিসিমাম *(Linum usitatissimum)*, গোত্র লাইনেসী ।

কান্ড চারফুট পর্যন্ত উঁচু নিচের দিকে শাখা অত্যন্ত কম কিন্তু উপরিভাগে গুচ্ছাকারে কয়েকটি শাখা উৎপন্ন হয় । পাতা সরু ল্যান্সের ন্যায়, উপপত্র থাকে না কিন্তু তিনটি করে শিরা প্রতিটি পাতায় ধারণ করে । ফলগুলি নীল বা সাদা, প্রায় দুই সে.মি. ব্যাস যুক্ত পুষ্প নিয়ত বিন্যাসে সজ্জিত। বৃতি ডিম্বাকার, অগ্রভাগ সূচাগ্র,

প্রান্তগুলি সাদা কখনো কখনো ছোট ছোট রোম যুক্ত। পাপড়ি পাঁচটি প্রসারিত, ফল ক্যাপসুল জাতীয় এবং বৃতিকে ছাড়িয়ে বেশ প্রসারিত হয়। ক্যাপসুলের খন্ডগুলি শক্ত রোমযুক্ত। বীজ চকচকে গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের ল্যান্সের ন্যায় চ্যাপ্টা।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, হিমালয় পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সমতল থেকে ছয়হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত চাষ হয়।

বিষাক্ত রাসায়নিক ঃ

সায়ানোজেনিক গ্লুকোসাইড, ফেজিওলোনেটিন, বীজে বিশেষ ভাবে সঞ্চিত থাকে। সাধারণত গাছের উচ্চতা ৫ সে.মি. পর্যন্ত হলেই সায়ানোজেনিক গ্লুকোসাইড হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড গাছে দেখা দেয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে তিসির বীজে প্রতিগ্রামে ৩৮০ মিলিগ্রাম হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বর্তমান। তিসির বীজ থেকে উৎপন্ন খৈলে ০.০৩২ — ০.০৪৫ শতাংশ পর্যন্ত হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড থাকে। কিছু কিছু বিজ্ঞানীর মতে ০.০৪ শতাংশ হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড অত্যন্ত বিষাক্ত। বিহারের বিভিন্ন জায়গায় তিসির খৈল খাওয়ানোর জন্য বহু গৃহপালিত জন্তুর মৃত্যু হয়েছে। গ্লুকোসাইড, লিনামারিন ইত্যাদি অপূর্ণ ফুল এবং অপুষ্ট বীজ থেকে পাওয়া যায়।

বিষাক্রান্তের লক্ষণ ঃ

সরাসরি এই গাছ খেলে গৃহপালিত জন্তুদের অতিদ্রুত হজমের ব্যাঘাত দেখা দেয় এবং পেটে তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটে। হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের বিষক্রিয়ায় শরীর দ্রুত অবশ হয়ে আসে এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে অসাড় হয়ে আসে।

চিকিৎসা ঃ

রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হলে অতি দ্রুত পাকস্থলীর অম্লের পরিমান কমিয়ে দিতে হবে। কৃষির সময় ফুল খেয়ে বিষাক্রান্ত হলে কাপড় কাঁচার সোডার দ্রবন অথবা অন্য কোন ক্ষার খাইয়ে দিলে এই বিষাক্ততা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সাবধানতা হিসাবে গৃহপালিত জন্তুকে এই উদ্ভিদ না খাওয়ানো উচিত অথবা কম পরিমানে খাওয়ানো উচিত যাতে রোগলক্ষন প্রকাশিত না হতে পারে।

কস্তুরী

হিমালয়ের পাদদেশে কস্তুরী জন্মালেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চারটি প্রজাতি পাওয়া যায় । ইংরেজী নাম লার্কস্পার কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে গারুয়াল অঞ্চলে এটি কস্তুরী ফুল নামে পরিচিত । এটি রেনানকুলেসী গোত্রের । বৈজ্ঞানিক নাম ডেলফিনিয়াম ব্রুনোনিয়েনাম *(Delphinium brunonianum)*। ডেলফিনিয়ামের অন্যান্য বিষাক্ত প্রজাতিগুলি হলো — কেইরুলিয়াম, ইলেটাম, ভেস্টিটোম । এর গোত্র রেনানকুলেসী।

কস্তুরী এক বা বহুবর্ষজীবী বেশ উল্লম্ব বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ । গ্রীক শব্দ ডেল্ফিনস্ কথাব অর্থ ডলফিন থেকে এ নামটি এসেছে । কারণ ফুলের গঠনের সহিত ডলফিনের সাদৃশ্য বিদ্যমান। ঠান্ডার সময় বহু বাগানে এগাছটি চাষ করা হয় । ফুলগুলি অসমান । বেগুনী, নীল অথবা সাদা । বৃতি পাঁচটি পেছনের দিকে স্পার যুক্ত, পাপড়ি ২-৪ টি ছোট্র, দুটি পার্শ্বীয় । পুংকেশর অনেকগুলি, ফল ফলিক্যল জাতীয়, বহুবীজ ধারণকাবী । বীজের বহিরাবরণ কুঞ্চিত ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

একোনিটিনের কাছাকাছি এলকালয়েড এ গাছে পাওয়া যায় । ত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এজাসিন, এজাকোনাইন, ডেলফিনাইন, ডেলকোসিন, ডেলফিনয়ডিন, ডেলসোলিন, ডেলটালিন, ডেলফিসিন, স্টেফিসাগ্রোইন ইত্যাদি । বীজের মধ্যে সর্বাধিক ডেলফিনাইন পাওয়া যায় এবং শুষ্ক ওজনের এটিপ্রায় ১.৩ শতাংশ ।

ব্যবহার

কাশ্মীরেব লে অঞ্চলে ডেলফিনিয়াম ব্রায়োনোনিয়েনাম কস্তুরী বিষ

রূপে পরিচিত । এমনকি স্থানীয় লোকরা বলে যে শিশির বিন্দু কস্তুরী গাছের পাতা বেয়ে নীচে পড়লে সে ঘাস খেয়ে ছাগল, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি তৃণভোজীরা মারা যায় । পশুর গায়ের উকুন মারার জন্য এ গাছের রস ব্যবহার করা হয় । ইউরোপে গোল কৃমি মারার জন্য কস্তুরী গাছের পাতার রস ব্যবহার করা হয় । যেহেতু এ গাছের পাতার রস ঝাঁঝালো তেঁতো, ফুলগুলি কটু স্বাদের এবং মুখে লাগার পরই কোষগুলি ঝিন্ ঝিন্ করতে থাকে এজন্য এ গাছ থেকে মানুষের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

চিকিৎসায় ঔষধের পরিমাণ বেশী হলেই রোগ লক্ষণ দেখা যায় । ইহা স্নায়ুতন্ত্রের উপর সর্বাধিক ক্রিয়া করে চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসে, তীব্র অরুচি এবং ধীরে ধীরে গা গোলানো দেখা দেয়, নাড়ীর স্পন্দন কমে আসতে থাকে।

চিকিৎসা

জলে চারকোল পাউডার গুলে খাইয়ে দিতে হবে । পাকস্থলীর সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য পানীয় স্যালাইন জল দিয়ে টিউবের মাধ্যমে পাকস্থলী ধুইয়ে দিতে হবে এবং লক্ষন অনুযায়ী চিকিৎসার জন্য ডাক্তাবের পরামর্শ নিতে হবে ।

কাকমারী

আসাম, ত্রিপুরা, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা, কঙ্কন, গোয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত এ গাছটি পরাশ্রয়ী গুল্ম রূপে জঙ্গলে বিশেষ ভাবে জন্মে । পাতাগুলি বেশ বড়, দৈর্ঘ্যে সর্বাধিক ১৩ সে.মি. এবং প্রস্থে ৫ সে.মি. প্রসারিত ডিম্বাকার । অগ্রভাগ সূচাগ্র, শিরাবিন্যাস একশিরাল জালিকাকার , পাতার উপরিতল গাঢ় সবুজ, নিম্নতল সাদাটে রোমাবৃত, পত্রবৃন্ত স্ফীত। পূর্ণ শাখার বৃন্তে ১৫ - ২৫ সে.মি. দীর্ঘ পুষ্পবিন্যাস গুলি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে । ফুলগুলি বেশ ছোট । ফল দুটি করে দুটি বৃন্তে অবস্থিত, কালো বর্ণের । গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম এনামিরটা কুকুলাস *(Anamirta cuculus)* গোত্র মেনীস্পার্মেসী।

ব্যবহার

এগাছের ফল তীব্র বিষাক্ত এবং ভারতে চুরি করে মাছ, পাখী এমনকি গরুকেও মেরে ফেলার জন্য এ গাছের পাতা খাইয়ে দেওয়া হয় । বিভিন্ন উপজাতিরা তীরের ফলার অগ্রভাগে এ ফলের রস মাখিয়ে দেয় এবং তীরের ফলার মাধ্যমে রক্তে এ রস মিশে বিষক্রিয়া দেখা দেয় ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

পিক্রোটক্সিন নামক একপ্রকার নন এলকালয়েড যৌগ বীজে বর্তমান । বীজে ১.৫ শতাংশ পিক্রোটক্সিন থাকে । এছাড়া পিক্রোটিন, এনামিরটিন নামক রাসায়নিক যৌগগুলি পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় । দুটি অ্যালকালয়েড ম্যানিস্পার্মিন এবং প্যারাম্যানিস্পার্মিন ফল থেকে পাওয়া গেছে কিন্তু তারা বিশেষ বিষাক্ত নয় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

মেরুদন্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে পিক্রোটক্সিন বিষাক্রান্তের লক্ষণ একই প্রকার । সর্বপ্রথম অত্যন্ত অস্থিরতা এবং তারপরই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখা গেছে । ধীরে ধীরে মুখ থেকে লালা নিঃসরণ হয়ে সামান্য বমির উদ্রেক হয় এবং হৃদযন্ত্রের গতি কখনো দ্রুত আবার তারপরই অত্যন্ত শ্লথ অবস্থায় চলে এসে শ্বাসকার্যের গতি বেড়ে যায় । শরীরে তীব্র কম্পন দেখা দেয় ও হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে থাকে । মাঝে মাঝে শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে আসে । আবার দ্রুত সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে । ফুসফুসের মাংসপেশী গুলির খিচুনীর জন্য অনেক সময় শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে । পিক্রোটক্সিনের সর্বাধিক বিষক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রে ঘটে ।

চিকিৎসা

বীজ থেকে বিষাক্রান্তের লক্ষন দেখা দিলে অতি দ্রুত বমি করিয়ে পাকস্থলীতে জল ঢুকিয়ে পরিস্কার করাতে হবে । ইহা ছাড়া ঔষধীযুক্ত কয়লার পাউডার জলে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে । অস্থিরতা কমানোর জন্য ডাইজীপাম টেবলেট একটি খাইয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ।

ভবন বাক্‌রা

পাঞ্জাবের বনকাক্‌ড়ী গাছ, মারাঠীতে পাটভেল, হিন্দি ও বাংলায় বন বাক্‌ড়া বা বন পাপড়া নামে পরিচিত। ইংরেজী নাম 'ইন্ডিয়ান মে অ্যাপল'। বৈজ্ঞানিক নাম পোডোফাইলাম হেক্সানড্রাম *(Podophyllum hexandrum)*। গোত্র বারবারিডেসী। হিমালয়ের পাদদেশে সিকিম থেকে পাঞ্জাব, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের পাহাড়ী অঞ্চলে পাঁচশ থেকে দেড় হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত গাছটি বিস্তৃত। কাশ্মীরে এ গাছ বহুল বিস্তৃত।
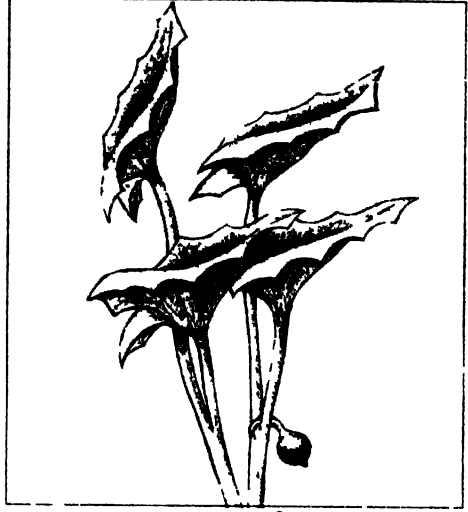
গাছটি খাড়া, বীরুৎ জাতীয় ছোট্ট ঝোঁপের ন্যায়। প্রায় ৩০ সে.মি. উঁচু, দ্যাগ্র শাখা বিন্যাস যুক্ত। পাতা সাধারণত দুটি এবং এক একটি পাতা ১২ - ১৫ সে.মি প্রসারিত, ৩-৫ টি খন্ডকযুক্ত এবং ফলকের প্রান্ত ধারালো দাঁতের ন্যায়। সবুজ পাতার উপর প্রায়ই বেগুনী বুটি দেখা যায়। গাছে সাধারণত একটি ফুল ফোটে কিন্তু কদাচিৎ দুটি ফুল দেখা যায়। ফুলগুলি কাপের ন্যায় তিন সে.মি ব্যাসযুক্ত সাদা বা গোলাপী। ছয়টি পাপড়ির নীচে তিনটি করে বৃতি থাকে এবং বৃতিগুলি ফুল ফোটলেই খসে পরে। ফল ডিম্বাকার বেরী জাতীয়, গাঢ় বেগুনী।

বিষাক্ত রাসায়নিক

রজন, পোডোফাইলীন এবং কেলাসিত পোডোফাইলোটক্সিন মৃদবর্তী রূপান্তরিত কান্ড থেকে পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রজাতিতে পোডোফাইলিন এর পরিমাণ ৩৮ শতাংশ। জলে দ্রবণীয় লিগনান গ্লুকোসাইড পোডোফাইলোটক্সিন ছাড়াও আরো ১৫টি কার্যকরী যৌগ রজন থেকে আলাদা করা গেছে।

ব্যবহার

পূর্বে কুষ্ঠ কাঠিন্য দূর করতে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে লিগনাইন গ্লুকোসাইড

ব্যবহৃত হতো । বর্তমানে জানা গেছে বন পাপড়া বা মে অ্যাপল এর গ্লুকোসাইড ক্যান্সারে দ্রুত কোষ বিভাজন রোধ করতে সক্ষম এবং এইজন্য ক্যান্সার চিকিৎসায় এটির সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা চলছে ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

একমাত্র উত্তর আমেরিকায় বিষক্রিয়ার লক্ষণ জানা গেছে । অনেক গবেষকের মতে কাঁচা ফল খেলে বমি শুরু হয় এবং চোখ জ্বালা করতে থাকে এবং ঝিল্লীকোষগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠে । চামড়ার ফাটা অংশে পোডোফাইলীন লাগার কয়েক ঘন্টার মধ্যে চামড়া ফুলে উঠে ও ফেটে যায় । এটি কার্যকরী ঔষধগুলিতে ব্যবহৃত হলেও ০.০১ গ্রাম/ডোজ এর বেশী পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগে অতিদ্রুত প্রবল তরল পায়খানায় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে । বিজ্ঞানীদের মতে পডোফাইলোটক্সীন কোষ্ঠ কাঠিন্য দুরীকরণে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু বিষক্রিয়ায় স্নায়ুতন্ত্র বিঘ্নিত হয় এবং শরীরের নিম্নাংশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে । শ্বাস ক্রিয়া অতি দ্রুত হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা কমে আসে ।

চিকিৎসা

বেশ কয়েকটি মে আপেল খেয়ে নিলেও রোগ সৃষ্টি বিশেষভাবে ঘটতে দেখা যায় না । কিন্তু একমাত্র বেশী পরিমানে কোষ্ঠ কাঠিন্যের ঔষধ হিসাবে এটি ব্যবহার করলে বিষক্রিয়ার লক্ষন দেখা দেয় । এইজন্য সাবধানতা হিসাবে এই গাছের রূপান্তরিত কাণ্ড ব্যবহার করা উচিত নয় । বেশী পরিমানে রোগ লক্ষন দেখা দিলে হাসপাতালে চিকিৎসায় নিয়ে যেতে হবে ।

মধু ফুল

মধু ফুল কথাটি গ্রীক শব্দ মেলি অর্থাৎ মধু এবং অ্যান্থাস অর্থাৎ ফুল । এই অর্থে গাছটির নাম মেলিঅ্যান্থাস মেজর *(Melianthus major)*, গোত্র সেপিনডেসী ।

গাছটি প্রায় ৩-৪ মিটার দীর্ঘ, ঝোপের ন্যায় শাখাযুক্ত, যৌগিক পাতার পত্রকগুলি ৭-১১ টি, ৫-৭ সে.মি দীর্ঘ বহু খাঁজ যুক্ত । উপপত্র সংযুক্ত হয়ে পর্বের অক্ষে কান্ডকে আবৃত করে থাকে । অসংখ্য ফুল ঘন সন্নিবিষ্ট এবং ফুলের গুচ্ছের আকৃতি বৃহৎ এমনকি ৩০-৩৫ সেমি. দীর্ঘ হতে পারে। মঞ্জরী পত্র অপূর্ব সুন্দর রঙ্গীন, ডিম্বাকার, প্রসারিত এবং অগ্রভাগ সূচাগ্র । দল পাঁচটি এবং ফুলগুলি লাল

থেকে পিঙ্গল লাল, ৩ সেমি দীর্ঘ। ফল ক্যাপসুল জাতীয় এবং কাগজের মত হাল্কা, অগ্রভাগ চারটি খন্ডকযুক্ত। প্রতিটি ডিম্বাশয়ের কোষে দুটি করে বীজ থাকে। বীজগুলি কালো চক্‌চকে। ভারতের নীলগিরি পর্বত মালায় এবং কুমায়ুনের বিভিন্ন অঞ্চলে গাছটি বিস্তৃত। এই উদ্ভিদটির উৎপত্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং এখন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এ গাছটি বিস্তৃত।

বিষাক্ত রাসায়নিক

মূলে তীব্র বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান। হাইপোগ্লাইক্যামিক অ্যামিনো অ্যাসিড, হাইপোগ্লাইসীন স্যাপিনডেসিতে বিদ্যমান। এমনকি ফলেও এই হাইপোগ্লাইসীন থাকে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

এ গাছের মূল খেলে তীব্র পেট ব্যথা ও আন্ত্রিক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। মুখে টকজল উঠতে থাকে এবং পায়খানার সাথে কাল মরা রক্ত নির্গত হয়ে প্রচন্ড দূর্বলতা দেখা দেয় ও ধীরে ধীরে মৃত্যু হয়। কিছু কিছু বিজ্ঞানীর মতে এই ফুলের মধু তীব্র বিষাক্ত এবং এই মধু থেকেও বিষাক্ততার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। একশগ্রাম পাতা একটি ভেড়াকে খাইয়ে দিলে ৩ - ৪ ঘন্টার মধ্যেই রোগলক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং প্রাণীটি মারা যায়। গাছটি শুকিয়ে রাখলেও তার বিষাক্ততা কমে না। তবে মৃত প্রাণীর ফুসফুস ফোলে যাওয়া লিভার ক্ষত হওয়া এবং ফুসফুস ফেটে যাওয়ার ঘটনা জানা গেছে।

চিকিৎসা

এই ফুলের রস নিয়ন্ত্রিত ভাবেই ব্যবহার করতে হবে। গৃহপালিত পশু যাতে এইসব গাছে মুখে না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগ লক্ষন দেখা দিলে লক্ষন অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

সিঙ্কোনা

কুইনাইন উৎপন্ন করার এ গাছটি স্যার রোনাল্ড রস আবিষ্কার করেন ম্যালেরিয়ার অষুধ রূপে।

বৈজ্ঞানিক নাম সিঙ্কোনা অফিসিনেলিস *(Cinchona officinalis)*, গোত্র রুবিয়েসী। সপ্তদশ শতাব্দীতে পেরুর ভাইসরয়ের স্ত্রী'র থেমে থেমে জ্বর হচ্ছিল। এ গাছের মুলের রস খেয়ে তিনি সুস্থ হয়ে যান। পরবর্ত্তী সময়ে এই গাছটিকেই ম্যালেরিয়া জ্বরের অষুধ রূপে আবিষ্কার করা হয়। ভাইসরয়ের স্ত্রী'র নাম ছিল চিঙ্কন এবং তার নামানুসারে এ গাছটির নাম হয়েছে সিঙ্কোনা।

এ গাছটি চিরহরিৎ অরণ্যের বৃক্ষ এবং গুল্ম। পাতা ছয় থেকে দশ সেন্টিমিটার, ল্যান্সের মতো আবার বেশ প্রসারিত ডিম্বাকার এবং পাতার অগ্রভাগ সূচাগ্র। পত্রবৃন্ত প্রায় তিন সে.মি. দীর্ঘ। একটি মধ্যশিরায় আট থেকে দশ জোড়া উপশিরা থাকে। কান্ডের কক্ষে রোমযুক্ত গর্ত্ত থাকে। কান্ডের বহিঃত্বক তেতো। বহু লাল ফুল গুচ্ছাকারে নিয়ত যৌগিক করিম্বে সজ্জিত। পুষ্পমঞ্জরীগুলি কান্ডের কক্ষে সাজানো থাকে। ফুল বেশ ছোট। পাপড়ি গুলি যুক্ত হয়ে এক থেকে দেড় সে.মি. দীর্ঘ নলাকার গঠন সৃষ্টি করে এবং তার মাথায় সিল্কের ন্যায় চক্‌চকে রোম থাকে। ফল ক্যাপসুল জাতীয়, একথেকে দেড় সে.মি. দীর্ঘ, ডিম্বাকার বা একটু লম্বাটে।

এই প্রজাতিটি পেরুর আদি গাছ। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে আড়াই হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এ গাছ ব্যাপক ভাবে চাষ হয়।

সিঙ্কোনা'র অপর প্রজাতি সিঙ্কোনা সাক্‌সিরোবরা *(Cinchona succirubra)* ইংরেজীতে বেড —বার্ক নামে পরিচিত। এ গাছটির আদি জন্ম ইকুয়েডর এবং বর্ত্তমানে ভারতের সিকিম, উট্‌কামন্ড, সাতপুরা ইত্যাদি পাহাড়ে চাষ হয়। গাছটি তীব্র প্রতিকুল পরিবেশ সহ্য করতে পারে বলে ভারতে এর চাষ

ব্যাপক ।এটিও দু'হাজার আটশ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে ।গাছটি প্রায় পঁচিশ মিটার পর্যন্ত লম্বা ।পাতাগুলি বেশ বৃহৎ, প্রায় ২০ সে.মি. প্রসারিত এবং বৃন্ত তিন সে.মি. পর্যন্ত দীর্ঘ। এর ফুলের বর্ণ গোলাপী এবং পাপড়ি এক সে.মি দীর্ঘ নলাকার ।ফলের মাথার দিকটা সরু কিন্তু মাঝখানটা প্রসারিত ।

অপর একটি প্রজাতি থেকেও কুইনাইন পাওয়া যায় ।বৈজ্ঞানিক নাম সিঙ্কোনা কেলিসায়া *(Cinchona calisaya)* এবং জাত লেড্‌জেরিয়ানা ।এরও পাতা বেশ বড়, প্রায় সাত সেন্টিমিটার দীর্ঘ, ফুল সাদা হলুদের মাঝামাঝি কিন্তু খুব সুন্দর গন্ধযুক্ত ।ফল ক্যাপসুল জাতীয় এবং অনেকটা লেঙ্গের ন্যায় ।এটি বলিভিয়ার গাছ এবং বর্ত্তমানে ভারতের বহু জায়গায় এর ব্যাপক চাষ হচ্ছে এবং সমস্ত প্রজাতির মধ্যে এটিরই অ্যালকালয়েডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী ।

ব্যবহার

সারা পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচার জন্য কুইনাইন ব্যবহৃত হয় । যেহেতু ম্যালেরিয়ার পরজীবীকে কুইনাইন ছাড়া অন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিকেও ভাল করা যায় না এই জন্য কুইনাইন ব্যবহার ছাড়া চলে না ।তাই বর্তমানে জ্বর দেখা দিলেই ডাক্তাররা দীর্ঘদিন সমানে কুইনাইন টেবলেট বা ইঞ্জেকশান দিয়ে থাকেন । কিন্তু তার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কুইনাইনের বিষক্রিয়া দেখা দেয় ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

কুইনাইন, কুইলিডাইন, সিঙ্কোনাইন, সিঙ্কোনাইডিন, কিউপ্রেইন এবং আরও কুড়িটি অ্যালকালয়েড এ গাছে বিদ্যমান ।এছাড়া কান্ডে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ থাকে ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

কুইনাইনের বিষক্রিয়ায় যে লক্ষণ প্রকাশিত হয় তার নাম সিনকোনিজম। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে বিশেষ ভাবে সর্বাধিক প্রভাবিত করে ।সিনকোনিন দ্বারা এই রোগ সর্বাধিক সৃষ্টি হয় ।এর প্রধান লক্ষণ হলো গা গোলানো, বমি বমি ভাব, মাথা ধরা, মাথা ঘোড়ানো, চোখে ঘোলাটে দেখা, সামান্য শব্দে অস্থির হয়ে যাওয়া, কান বন্ধ হয়ে আসা, মুখের স্বাদ ও গন্ধ বোধ চলে যাওয়া, বিমর্ষতা, আলো দেখলেই বিরক্ত হওয়া এবং ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাওয়া ।খুব বেশী পরিমাণে কুইনাইন খেয়ে নিলে তল পেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা, বমি, পেশীর দূর্বলতা, মুখের জড়তা, চিন্তা ধারায় বিভ্রান্তি, দেহের অসাড়তা ও কোমা দশার পর মৃত্যু হয় ।

কুইনাইন থেকে চামড়ায় ক্ষত তৈরী হয় বা ফোলে উঠে বা জিহ্বা, মুখ, চোখের পাতি ইত্যাদি অনেকের ক্ষেত্রে ফোলে যায় । বেশী পরিমাণে কুইনাইনের প্রভাবে মূত্রের সহিত অ্যালবুমিন নির্গত হতে থাকে । যকৃত ও প্লীহা'য় বিষক্রিয়া করে এবং রক্ত কোষকে মেরে দেয় ।

এছাড়া কুইনাইন ব্যতীত অন্যান্য সিঙ্কোনা অ্যালকালয়েড থেকে প্রাথমিক ভাবে দেহে কম্পন দেখা দেয় । বেশী পরিমাণে কুইনিডিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকে অসাড় করে দেয় । সিনকোনাইন কুইনাইনের চেয়ে অনেক বেশী বিষাক্ত ও মুখে প্রচন্ড লালা সৃষ্টি করে । গাঁজাব নেশার ন্যায় নেশা হয় কিন্তু রক্তচাপের উপর এর কোন ক্রিয়া নেই ।

চিকিৎসা ঃ

সিঙ্কোনিজম দেখা দিলে বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করেও ভালো ফল পাওয়া যায় না । তবে কুইনাইন ইনজেক্শন দেওয়ার আগে নিয়ন্ত্রিত পরিমানে ক্যাফেইন ইনজেকশন দিলে মাথা ধরা ও আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গ কমে যায় । তবে নিজ হাতে চিকিৎসা শুরু না করে বিষেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে । লক্ষন অনুযায়ী চিকিৎসা করে ভাল ফল পাওয়া যায় । বহু ডাক্তার হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড কুইনাইনের সাথে ব্যবহার করে এবং তাতে অনেক ভালো ফল পাওয়া যায় । ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ কেজি কুইনাইন ম্যালেরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় ।

অন্তমূল

আসাম, ত্রিপুরা, কাছার, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, দক্ষিণ ভারতের সমতল, কোংকন, হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত এমনকি বাংলাদেশেও এগাছ বিশেষ বিস্তৃত । এটি বহুবর্ষজীবী এবং লতানো, অন্য গাছকে প্যাঁচিয়ে উঠে । গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম টাইলোফোরা ইন্ডিকা *(Tylophora indica)* । গোত্র এসক্লিপিয়াডেসী ।

মূল বেশ রসালো, বড় । পাতা ডিম্বাকার । প্রায় ছয় থেকে সাত সে.মি দীর্ঘ এবং পাতার অগ্রভাগ সূচাগ্র । পত্রবৃন্ত প্রায় দুই সে.মি দীর্ঘ । ফুল বেশ বড়, ফ্যাকাশে বাইরের দিকটা, কিন্তু ভেতরের দিকটা বেগুনী । ফুলগুলি পেঁয়াজ কলির ন্যায় এবং তার পাশে সরু দীর্ঘ মঞ্জরী রয়েছে । বৃতিগুলি লেন্সের ন্যায় কিন্তু পাপড়ি গুলি প্রসারিত । ফল প্রায় ছয় সে.মি দীর্ঘ । আকন্দ ফলের ন্যায় । মাঝখানটা বেশ মোটা, দুই প্রান্ত সরু ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

গাছের বিভিন্ন অংশ যথা পাতা, মূল, কান্ড ইত্যাদিতে সর্বাধিক ০.৩ শতাংশ অ্যালকালয়েড পাওয়া গেছে । তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো টাইলোফোরিন, টাইলোফোরিনিন, ভেনসিট্রকসিন এবং অন্যান্য স্টেরয়েড জাতীয় গ্লুকোসাইড এবং সেপোনিনের ন্যায় রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান ।

ব্যবহার

ইপিকাকের পরিবর্ত হিসাবে এ গাছটির ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায় । পাতা চূর্ণ করে দিনে তিনবার পাঁচ মিলিগ্রাম করে খাওয়ালে এটি কফের ঔষধ রূপে কাজ করে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

এই গাছের অ্যালকালয়েড থেকে উৎপন্ন ঔষধের পরিমাণ বেশী হলে হৃদযন্ত্রের পেশীগুলি দূর্বল হয়ে যায় । রক্তচাপ প্রথমত কমে আসে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বাড়তে থাকে এবং এই রক্ত চাপের বৃদ্ধি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় । এই অ্যালকালয়েডটি ঔষধ রূপে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় । কিন্তু পরিমাণের তারতম্যের ফলে ভারতবর্ষে কিছু মৃত্যুর ঘটনাও জানা গেছে । গ্রাম্য ডাক্তারদের উপদেশে গোনোরিয়ার ঔষধ রূপে এই গাছের রস খেয়ে মৃত্যুর ঘটনাও জানা গেছে । বারো ঘন্টা পরই প্রচন্ড কম্পন এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয়, গলা জ্বালা, বমি, সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে এবং পরে মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা

টাইলোফরিন অত্যন্ত বিষাক্ত এবং অতি দ্রুত মৃত্যু ঘটাতে পারে । এইজন্য এই গাছের রস পেটে গেলে খুব দ্রুত পাকস্থলী ধৌত করা, বমি করানো, কার্যকরী চারকোল পাউডার খাইয়ে দেওয়া এবং এসব করার সাথে সাথে আই. সি. ইউতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে ।

কুচিলা

গাছটি পনেরোশ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে বিশাল বৃক্ষ হিসাবে জন্মায় । বিহার এবং উত্তর প্রদেশের জঙ্গলে, কোংকন, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, কর্নাটিক এবং তামিলনাড়ুর জঙ্গলে এবং হিমালয়ের পাদদেশে পাওয়া যায়। ভারত ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এটি বিস্তৃত । তাই হিন্দিতে এর নাম কাজরা, নেপালে নির্মলী, তামিল ও তেলেগুতে ইট্টি ইত্যাদি বহু নামে পরিচিত ।ইংরেজী নাম পয়জন নাট এবং বৈজ্ঞানীক নাম স্ট্রিকনস নাক্সভোমিকা *(Stricnos nux-voumica)*। গোত্র লোগানিয়েসী ।

গাছটি পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং শাখার অক্ষে কাঁটা ধারণ করে । পাতাগুলি বেশ প্রসাবিত, ১০ সে.মি দীর্ঘ এবং ৫ সে.মি প্রস্থ, অর্ধচন্দ্রাকার, ফলকের মাথাটি সরু, চক্‌চকে এবং পাঁচটি করে শিরা যুক্ত । ফুলগুলি গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয় । অতি ছোট্ট পাপড়ি এবং ১ সে.মি থেকেও ছোট । ফলগুলি বেরী জাতীয়, গোলাকার এবং পেকে গেলে লালচে কমলা রঙের হয় । ভেতরে অসংখ্য বীজ থাকে ।

রাসায়নিক যৌগ

এলকালয়েড স্ট্রিকনাইন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ।এছাড়া ব্রুসিন, গ্লুকোসাইড লোগানিন, ভোমিসিন, আলফা - কোলোব্রাইন, বিটা - কোলোব্রাইন, সিউডো স্ট্রিকনাইন, স্ট্রেচিনিসিন পাওয়া যায় । উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে এ সমস্ত এলকালয়েড বিস্তৃত । তার মধ্যে বীজে সর্বাধিক ৩.৪২শতাংশ এলকালয়েড পাওয়া যায় । এছাড়া নূতন শাখার বহিঃত্বকে ৩.১ শতাংশ ও পুরানো শাখাগুলির বহিঃত্বকে ১.৬৮ শতাংশ এলকালয়েড পাওয়া যায় । মূলে ০.৭১ শতাংশ স্ট্রিকনিন পাওয়া যায় । সর্বাধিক ০.৭ শতাংশ স্ট্রিকনিন বীজে পাওয়া গেছে ।

ব্যবহার

এ গাছের বীজ পাউডার করে ঘোড়াকে টনিক হিসাবে খাওয়ানো হয়

কিছু কিছু অঞ্চলের মানুষ এর ফল বেটে খায় । স্থানীয় কবিরাজরা কুচিলা গাছকে পেটের রোগের চিকিৎসার জন্য এবং সাস্থ্য বর্ধক রূপে ব্যবহার করে থাকেন । যাদের পেটে ঘা হয় এবং বদ হজম হয় তাদের চিকিৎসার জন্য নাক্স ব্যবহার করা হয় । যে সমস্ত অঞ্চলের গরু নাক্স ভোমিকার পাতা খায় তাদের দুধে একটু তেতোঁ স্বাদ হয় কিন্তু যারা এই দুধ খায় কুচিলা পাতার প্রভাবে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে । কিছু কিছু জায়গায় দেশী মদ তৈরীতে এর বীজ মিশিয়ে দেওয়া হয় যাতে মদের নেশা বেড়ে যায় । মাছ মারার বিষ হিসাবে কুচিলা পাতার রস ব্যবহৃত হয় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

কুচিলা ফলের বীজে মৃত্যুর ঘটনা বহু বিজ্ঞানী উল্লেখ করে গেছেন । আস্ত ফল গিলে ফেললে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয় না কারণ বীজের প্রাচীর জলে দ্রবনীয় নহে । কুর্চি গাছের পরিবর্তে কুচিলা গাছের কান্ডের বহিঃত্বক খেয়ে মৃত্যুর ঘটনাও জানা গেছে । ন্যাক্স ভোমিকা অর্থাৎ কুচিলা পাতা খেয়েও মৃত্যুর ঘটনা জানা গেছে । স্ট্রিকনিন মুখে গেলে লালা নিঃসরণ বেড়ে যায় এবং পরিমাণে বেশী হলে পেট ব্যথা, পেটে গ্যাস হওয়া, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরানো, গা গোলানো, চোখে আরষ্ঠ ভাব ইত্যাদি দেখা দেয় ।

চিকিৎসা

স্ট্রিকনিনের বিষাক্ততা দেখা দিলে লক্ষন অনুযায়ী চিকিৎসা প্রয়োজন । খুব দ্রুত বমি করানোর জন্য এক শতাংশ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবন ব্যবহার করা যেতে পারে । যখন টনিক হিসাবে ঐ ঔষধ ব্যবহৃত হয় তখন পরিমানের দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন । গাছের ছাল খাওয়ার আগে কবিরাজী ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয় এবং ব্রুসিনের পরিমান না জেনে এই গাছের কোন অংশ ব্যবহার করা ঠিক নয় ।

ইপিকাক

ঔষধি গাছরূপে পরিচিত ইপিকাক গ্রীক শব্দ সাইকী থেকে এসেছে । এই জন্য গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম সাইকোট্রিয়া ইপিকাকোয়েনহা, *(Psychotria ipecacuanha)* । গোত্র এপোসাইনেসী ।

ছোট্র ঝোঁপ জাতীয় উদ্ভিদ থেকে বড় বৃক্ষএমনকি শায়িত প্রজাতিও পাওয়া

যায় । পাতাগুলি ডিম্বাকার বা সামান্য প্রসারিত, ফলকের অগ্রভাগ সূচাগ্র, সম্পূর্ণ, পত্রবৃন্ত ছোট্ট এবং ফলকের উপরিভাগ চক্‌চকে । উপপত্র দুটি পাতার মাঝামাঝি থাকে এবং অক্ষে বহু রোম থাকে । ফুল গুলি গুচ্ছাকারে বা একক ভাবে সজ্জিত থাকে এবং পাপড়ি গুলি যুক্ত হয়ে কক্ষীর ন্যায় আকৃতি ধারণ করে । ফল গোল বা ডিম্বাকার ।
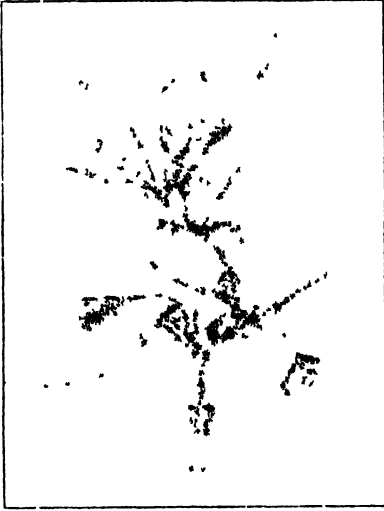
ভারতবর্ষে নীলগিরি, দার্জিলিং ইত্যাদি অঞ্চলে এগাছটি ব্যাপক ভাবে চাষ করা হয় যদিও ব্রাজিলে এটি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে । এ গাছটি সর্বাধিক ৪০ সে.মি উঁচু এবং মূলগুলি গাঢ়ত্বক যুক্ত ।

বিষাক্ত রাসায়নিক

ইপিকাকে এলকালয়েড অ্যামিটিন, সাইকোট্রিন, সেফিলিন, অ্যামিটামাইন ও মিথাইল সাইকোট্রিন, ইপিকামাইন এবং হাইড্রোইপিকামিন থাকে । এছাড়া ইপিকাকোয়েনহিন পাওয়া যায় । ভারতীয় জমিতে চাষ করা প্রজাতির এলকালয়েডের পরিমাণ ২ শতাংশ এবং এমিটিনের পরিমাণ ১.৪ শতাংশ । অ্যামিটিন এবং সেফিলিন দুটি কার্যগত ভাবে খুব কাছাকাছি ।

ব্যবহার

চিকিৎসার সময় কম পরিমাণে ইপিকাক দিলে শ্বাসনালীগুলি প্রসারিত হয় বলে কফ বেরিয়ে যায় । এইজন্য ঔষধ হিসাবে অ্যামিটিন ব্যবহৃত হয় ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

এ গাছের এলকালয়েড গুলির স্পর্শে তীব্র জ্বালা সৃষ্টি হয় এবং চামড়ার উপর ফোলে যাওয়া, গর্তের মত ক্ষত হয়ে যাওয়া বা ছোট ছোট ফুসকুরী উঠা ইত্যাদি দেখা দেয । মূল চূর্ণ করার সময় চোখে মূলের চূর্ণ গেলে চোখ ফোলে উঠে এবং শ্বাস ক্রিয়ার সাথে ফুসফুসে ঢুকলে প্রচন্ড কাশ, হাঁচি, নাক জ্বালা, হাঁপানীর টানের ন্যায় টান উঠে । সামান্য পরিমাণ এলকালয়েড মুখে গেলে খুব দ্রুত গা

গুলিয়ে বমি আসে এবং এই বমির ভাব ঘন্টা খানেক থাকে এবং ঘন্টা খানেক পর থেকে পাতলা পায়খানা হতে থাকে । হৃদযন্ত্রের বেশীগুলি প্রসারিত হওয়ার ফলে হৃদযন্ত্রটি বড় হয়ে যায় এবং রক্তচাপ কমে আসে । নির্দিষ্ট অনুপাতের বেশী অ্যামিটিনের প্রয়োগ অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বারবার এমিটিন প্রয়োগে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে । সামান্য বেশী পরিমাণ ঔষধে হাত পায়ে কম্পন, নাড়ীর দ্রুতগতি, খাওয়ার ইচ্ছা বিলোপ এবং খেতে গিয়ে খাওয়া আটকে যাওয়া, অজ্ঞানতা ভাব ইত্যাদি দেখা দেয় । হাঁটাচলায় এবং খাদ্য গ্রহণে অসুবিধা দেখা দেয় । এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে ।

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরাও এই গাছের বিষাক্ততায় আক্রান্ত হয় । ৫ গ্রাম অ্যামিটিন একটি ঘোড়াকে মেরে ফেলতে পারে । তার চেয়ে কম পরিমাণ প্রয়োগে কুকুর এবং বিড়ালেরও মৃত্যু ঘটে ।

চিকিৎসা

রোগলক্ষন প্রকাশিত হওয়ার পর কোন প্রকার এমিটিন ইনজেকশন দেওয়া চলবে না । এমনকি ইনজেকশন দেওয়ার সময় হাত পায়ে কম্পন অনুভূত হলে রোগীকে বিশ্রামে রাখতে হবে, যতক্ষন না রোগী সুস্থতা বোধ করে । বাস্তবে চিকিৎসার জন্য এমিটিন যথাসম্ভব কম প্রয়োগ করাই ভালো ।

উঁন্দাল

এই গাছটির কোংকন ভাষায় নাম হলো উন্দাল, তেলেগুতে মডিক্কা । এর বাংলা নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি কারণ বাংলায় এর বসবাস লক্ষ্য করা যায় না । এই গাছটি একমাত্র পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা, কোংকন এবং কানাড়া এবং আশে পাশের পাহাড়ী অঞ্চলে বিস্তৃত । গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাডিনিকা পালমাটা *(Adenica palmata)* । গোত্র পেসিফ্লোরেসী । ভারতে আরেকটি প্রজাতি পাওয়া যায় । নাম অ্যাডিনিয়া উইটিয়ানা । অপর একটি বিদেশী প্রজাতি ডিজিটাটাও বিষাক্ত ।

এই গাছটি বহু বর্ষজীবী বীরুৎ এবং বহুদিন বেঁচে থাকে বলে নীচের অংশটি কাষ্ঠল হয়ে যায় । গাছের কান্ডের পর্বগুলি স্ফীত থাকে । মূল মোটা মূলার ন্যায় দেখতে । পাতা বেশ বড়, আট সে.মি প্রস্থ ও প্রায় বারো সে.মি দৈর্ঘ্য । পাতাগুলি বড় বড় তিন থেকে পাঁচটি খন্ডে বিভক্ত । পত্রবৃন্তে দুটি করে গ্রন্থি থাকে । প্রতিটি পাতার